বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকতর আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রদানের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোস্তফা কামাল মুজেরী*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো স্বল্প সম্পদশীল দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার অর্থায়ন (Finance)। দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগণের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া অপরিহার্য।[১] ঋণ, সঞ্চয় ও বীমা ইত্যাদি একাধিক বিষয় আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি ও খানা পর্যায়ে সামাজিক ও আর্থিক সফলতার সকল ক্ষেত্রে আর্থিক সেবা প্রাপ্তির উপকারী প্রভাব বিষয়ে অনেক গবেষণালব্ধ তথ্য-প্রমাণ রয়েছে (দেখুন King and Levine 1993, Beck *et al.* 2000, Beck and Demirgue-Kunt 2004, Levine 2005, Demirgüc-Kunt *et al.* 2008)। দেশের উন্নয়ন কৌশলসমূহেও স্বীকার করা হয়েছে যে সমাজের দরিদ্র ও অপরাপর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা-সহায়তা পৌঁছে দিতে না পারলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং ফলস্বরূপ সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

সম্পদের সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও উৎপাদনশীল ব্যবহারে তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। এটি প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের অর্থায়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও সাধন করে যেমন সঞ্চয়, অর্থায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেবা-পণ্য সরবরাহ। আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও স্থায়িত্ব- এ দুটো দিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও সাম্প্রতিক উন্নয়ন নীতি কৌশল আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা আর্থিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ না থাকলে সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধির গতি ধীর হয়ে পড়ে এবং ব্যাপকতর সামাজিক Exclusion ঘটে। পক্ষান্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা সুযোগের প্রসার ও সমতার উপর দৃষ্টি দেয় এবং ইতিবাচক প্রণোদনামূলক প্রভাব সৃষ্টি করে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হয় ও অর্থনীতিতে তা ব্যবহৃত হয়। একটা উন্নত অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা কেবল সম্পদ আহরণ ও তার ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না অধিকন্তু যাদের আর্থিক সেবার প্রয়োজন রয়েছে এমন সকলের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা অর্থনীতিতে বহুবিধ সুবিধা প্রদান করে। এটা বিনিয়োগ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে প্রয়োজনীয় অধিকতর সম্পদ

---

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

[১] বাস্তবে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি প্রত্যয়টির নানা ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন কিছু পরিবার বা খানা আর্থিক সেবা-সহায়তায় বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অন্যদিকে এমন খানা রয়েছে যাদের বর্তমানে আর্থিক সেবা-সহায়তা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে। আবার এমন পরিবার রয়েছে যারা আর্থিক সেবা-সহায়তা পেতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক বাজারের অনুপস্থিতি বা উচ্চ লেনদেন খরচ বা উচ্চ ঝুঁকি বা অন্যান্য কারণে আর্থিক সেবা-সহায়তা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। এ প্রবন্ধে কোনো একটি বা একাধিক বাজার থেকে বর্তমানে আর্থিক সেবা-সহায়তা পাচ্ছে এই অর্থে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবাহের ব্যবস্থা করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, ঝুঁকি হ্রাসকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য লাঘবে সহায়তা করে।[২] একটা কার্যকর ও সুপরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সুবিধা প্রাপ্তি জনগণকে অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারে। বস্তুত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষদের টার্গেট করে আর্থিক সেবার প্রসার আর্থিক সেবা প্রাপ্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের কোনো অংশই আর্থিক সেবা-সহায়তার আওতার বাইরে থাকে না।[৩] আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়টা ব্যাপক ও বিস্তারিত এবং এটি বলতে সহজ উপায়ে মানসম্মত আর্থিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের সকল অংশের কাছে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির সমান সুযোগ প্রসারিত করা এবং অর্থনীতিতে আর্থিক অসমতা বা বৈষম্য হ্রাস করাকে বোঝায়।

বাংলাদেশে আর্থিক বিস্তৃতি (financial deepening)-এর নিবিড়তা অত্যন্ত কম এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের প্রসার-সীমা (outreach) সীমিত হওয়ার কারণে ঋণ দানের সুযোগও সংকীর্ণ। দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) কর্মকাণ্ড প্রসারের সাথে সাথে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এমএফআইয়ের আবির্ভাব এবং উন্নয়ন নীতি হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়ার কারণে আর্থিক সেবা-সহায়তায় প্রবেশের সুযোগ ও ব্যাপ্তি সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে পল্লী আর্থিক বাজার আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংগঠিত ও সুবিকশিত। শহরাঞ্চলের আর্থিক বাজারের বিশেষ দিক হলো শহর এলাকায় আনুষ্ঠানিক (formal) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রীকরণ। ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকসমূহ তাদের নেটওয়ার্ক প্রায় ৮,৭০০ টি শাখায় এবং এমএফআইগুলো ১৭,০০০টি শাখায় বিস্তারিত করেছে। দেশের ব্যাংকসমূহের মোট শাখার ৫৭ শতাংশের বেশি গ্রাম এলাকায় অবস্থিত।[৪]

২। বাংলাদেশে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি: একটি পর্যালোচনা

আর্থিক সেবায় প্রবেশ লাভের ব্যাপ্তি বা অর্থনীতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অবস্থা পরিমাপে বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে (দেখুন Mehrotra *et al.* 2009, Sarma and Pais 2011, UN 2006)। ব্যাপকভাবে বললে, এসব সূচক আর্থিক সেবা-সহায়তার দুটো দিক নির্দেশ করে: (১) কার্যক্রমের

[২] গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অপরাপর এনজিওদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ঋণ সেবা-সহায়তার প্রাপ্তি বা সুযোগ দারিদ্র্য হ্রাস, মাইক্রো প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। ঋণ সেবা-সহায়তার অনুকূল প্রভাব বিষয়ে বহু গবেষণালব্ধ তথ্য-প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ বা তহবিল সংকট রয়েছে এবং ব্যাংক ঋণ সুবিধায় তাদের প্রবেশ সীমিত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন SEDF 2006, IFC 2014)।

[৩] জাতিসংঘের মতে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা সকল ব্যাংক সেবা পাওয়ার উপযোগী সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সেবা, বীমা করার উপযুক্ত সকলকে বীমা সেবা এবং প্রত্যেককে সঞ্চয় ও পেমেন্ট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে (দেখুন UN 2006)। সাধারণভাবে বলা হয় যে, আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তির অনুপস্থিতি অর্থাৎ আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়স্বরূপ (দেখুন Beck *et al.* 2008)। এ যুক্তিও দেখানো হয়ে থাকে যে, একটা উন্মুক্ত ও উদার এবং দক্ষ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক (social) সেবা ও পণ্যে সকলের অবারিত প্রবেশের সুযোগ। যেহেতু ব্যাংকিং সেবা সামাজিক পণ্য সেহেতু আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া দেশের সমগ্র জনগণের কাছে ব্যাংকিং ও পেমেন্ট সেবার সহজ প্রাপ্তি হিসেবে দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, কম খরচে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংক ও ঋণ সেবা-সহায়তা প্রদান করা। আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হলো আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা কর্তৃক সঞ্চয়, ঋণ, বীমা, পেমেন্টস, রেমিট্যান্স সুবিধাদি এবং আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ/উপদেশমূলক সেবা প্রদান করা (দেখুন RBI 2008)।

[৪] উদাহরণস্বরূপ এমএফআইগুলো এককভাবে ২০০৯ সালে ঋণ বিতরণ করেছে ৩৫০ বিলিয়ন টাকা এবং নীট সঞ্চয় আহরণ করেছে ১৬০ বিলিয়ন টাকা (দেখুন BB 2014)।

প্রসার সীমা (outreach) এবং (২) সেবা-সহায়তার প্রকৃত ব্যবহার। প্রসার-সীমা পরিমাপের ক্ষেত্রে দু' ধরনের সূচক রয়েছে: ভৌগোলিক বা অবস্থানগত নিবিড়তা (প্রতি হাজার কিলোমিটারে ব্যাংকের শাখা বা এটিএম বুথের সংখ্যা) এবং জনমিতিক বা ডেমোগ্রাফিক নিবিড়তা (প্রতি লাখ মানুষে ব্যাংকের শাখা বা এটিএম বুথের সংখ্যা)। প্রতি ১০০০ কিলোমিটারে অধিক সংখ্যক ব্যাংকের শাখা ও এটিএম বুথের উপস্থিতির অর্থ নিকটতম শাখা থেকে খানার কম দূরত্ব ও সহজতর ভৌগোলিক সুবিধা। জনমিতিক নিবিড়তা প্রতি ব্যাংক শাখা বা এটিএম বুথ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা পরিমাপ করে। এক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় ব্যাংকের শাখা বা এটিএম বুথের উপস্থিতি প্রতি শাখা বা এটিএম বুথ কর্তৃক অল্পসংখ্যক গ্রাহককে সেবা প্রদান করা এবং ব্যাংক সেবার সহজপ্রাপ্তির নির্দেশ করে। Sarma and Pais (2011) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাত্রা পরিমাপে একটা বহুমাত্রিক সূচক ব্যবহার করেন যার অন্তর্ভুক্ত হলো ব্যাংক পরিব্যাপ্তি বিষয়ক তথ্য, ব্যাংকিং সেবার সহজলভ্যতা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা ব্যবহার। Demerguc-Kunt *et al.* (2008)ও সাধারণ ব্যাংক শাখা বা এটিএম বুথ থেকে সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ে জনমিতিক ও ভৌগোলিক তথ্য সংকলন করেন।

আর্থিক সেবা-সহায়তার প্রকৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটো বহুল ব্যবহৃত সূচক হলো: (১) প্রতি হাজার মানুষে ঋণ হিসাবের সংখ্যা এবং (২) প্রতি হাজার মানুষে আমানত বা ডিপোজিট হিসাবের সংখ্যা। এসব সূচক ব্যাংক সেবার ব্যবহার বা আর্থিক সেবা প্রাপ্তিকে পরিমাপ করে। সেবা-সহায়তার প্রকৃত ব্যবহার পরিমাপে অন্য একটি প্রায়শ ব্যবহৃত সূচক হলো আমানত-জিডিপি অনুপাত বা ঋণ-জিডিপি অনুপাত বা (আমানত এবং ঋণ)-জিডিপি অনুপাত।

২.১। আর্থিক বাজার কাঠামো

বাংলাদেশে আর্থিক বাজার আনুষ্ঠানিক (formal) বাজার (আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক), আধা-আনুষ্ঠানিক (quasi-formal) বাজার (ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতি) এবং অনানুষ্ঠানিক (informal) বাজার (মহাজন, ব্যবসায়ী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন) এ তিন ধরনের বাজার নিয়ে গঠিত। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে এবং যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনমূলক ও অন্য উদ্দেশ্যে ঋণের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরকে ঋণ প্রদান করে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি প্রশমনমূলক সেবা দিয়ে থাকে।

এ তিন ধরনের বাজার বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক। আনুষ্ঠানিক বাজারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমানত সংগ্রহ করে এবং যাদের আর্থিক সম্পদ প্রয়োজন তাদেরকে ঋণ দেয়। এ বাজারে সুদের হার নমনীয় হয়ে থাকে এবং তা বাজারের বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ বাজারে আর্থিক সেবা প্রদানের খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন ব্যাংক (কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক সহ)। এছাড়া অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ বাজারের অন্তর্ভুক্ত। আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক এ উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক বিগত বছরগুলোতে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। কেবল ব্যাংকের শাখার সংখ্যাই বাড়েনি অধিকন্তু আহরিত আমানত এবং ঋণ প্রদানের পরিমাণও ঊর্ধ্বগতিতে বেড়েছে।[৫]

[৫]তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ব্যাংক ডিপোজিট (আন্ত:ব্যাংক লেনদেন বাদে) জুন ২০০৭ সালের শেষ নাগাদ ১৯৭০.১ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে জুন ২০১৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৭২৯.৭ বিলিয়ন টাকা। একই সময়কালে ব্যাংক ঋণের (আন্ত:ব্যাংক ও বিদেশী বিল ছাড়া) পরিমাণ ১৬১৪.২ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ৪৩৭০.২ বিলিয়ন টাকা হয়েছে (দেখুন BB 2014)।

আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার মূলত দরিদ্র পরিবারগুলোকেই আর্থিক সেবা-সহায়তা দিয়ে থাকে। একক বা ব্যক্তিগত লেনদেনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এ বাজারে লেনদেনের পরিমাণ সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি বলে প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক বাজারের কর্মকাণ্ড বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। সুদের হার অত্যধিক কম থেকে অত্যধিক বেশি হয়ে থাকে। যদিও অনানুষ্ঠানিক বাজার শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তথাপি আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও নমনীয়তা, নৈকট্যতা, সহজ পরিচালনা ইত্যাদি কারণে এ বাজার এখনও চালু রয়েছে। অনানুষ্ঠানিক বাজার সাধারণত অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতা ও অনানুষ্ঠানিক সঞ্চয় (অনানুষ্ঠানিক সংগঠন যেমন অনানুষ্ঠানিক সমবায় ও ক্লাব ইত্যাদির মাধ্যমে) নিয়ে গঠিত।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত চার ধরনের ব্যাংক নিয়ে গঠিত: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্রীয় আর্থিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা বিশেষায়িত ব্যাংক (ডিএফআই), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশের মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৫৬টি, যার মধ্যে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশী ব্যাংক রয়েছে। এসব ব্যাংকের মোট শাখা ৮,৬৮৫টি (সারণি ১)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও (২০০০ সালের ৬,১১৯ টি থেকে ২০১৩ সালে ৮,৬৮৫ টিতে) মোট ব্যাংক শাখায় পল্লী শাখার সংখ্যা আনুপাতিক হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে মোট ব্যাংক শাখায় পল্লী শাখার অংশ ছিল ৬০ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ৫৭ শতাংশে পৌঁছে।

ব্যাংক শাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গ্রাম-শহর বিভাজন থেকে দেখা যায় যে, ব্যাংকের শাখা ব্যাপকভাবে শহর এলাকায় কেন্দ্রীভূত। এ বিভাজন থেকে আরও দেখা যায়, পল্লী এলাকার পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির ব্যাপ্তি শহর এলাকার ন্যায় একই হারে বাড়েনি। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতি লাখ মানুষে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বেড়েছে এবং ২০০৩ সাল থেকে প্রতি ১০০০ কিলোমিটারে ব্যাংক শাখার সংখ্যা বেড়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ব্যাংক থেকে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য।

সারণি ১

বাংলাদেশ ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাঠামো, ২০১৩

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ		আমানত	
			বিলিয়ন টাকা	সম্পদের %	বিলিয়ন টাকা	আমানতের %
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক	৪	৩,৫২০	২১০৮.৫	২৬.৪	১৬৩১.২	২৬.০
উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪	১,৪৯৪	৪৫৪.৮	৫.৭	৩৪৩.০	৫.৫
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	৩,৬০২	৪৯৪৮.২	৬১.৯	৩৯৩৯.২	৬২.৮
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬৯	৪৮৮.৭	৬.১	৩৫৯.৫	৫.৭
মোট	৫৬	৮,৬৮৫	৮০০০.২	১০০	৬২৭৩.০	১০০

উৎস: BB (2014)।

গত দু'দশকে পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক থেকে অগ্রিম গ্রহণ (advance) ও ব্যাংক আমানতের (deposit) পরিমাণ বেড়েছে (সারণি ২)। অবশ্য পল্লী এলাকায় পল্লী ডিপোজিটের অংশ হিসেবে অগ্রিম কমেছে—১৯৯১ সালের ৭৯ শতাংশ থেকে কমে ২০০৯ সালে ৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। পল্লী এলাকায় অগ্রিম কমে যাওয়া বোঝায় যে ব্যাংকগুলো শহর এলাকায় ঋণ দিতে বেশি আগ্রহী এবং পল্লী এলাকার ব্যাংকসমূহে আহরিত আমানত শহর এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। প্রবৃদ্ধি, ইক্যুইটি ও কল্যাণ ইত্যাদি বিবেচনায় ঋণ দানের এরকম গ্রাম-শহর কাঠামো যুক্তিযুক্ত হতে পারে কেবল তখনই যখন পল্লী ঋণের চাহিদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে পূরণ করা হয়। এ বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলেও পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্রঋণের দ্রুত ও বর্ধমান চাহিদা এটাই নির্দেশ করে যে পল্লী এলাকায় অধিক পরিমাণে আর্থিক সম্পদের অন্তর্প্রবাহ দরকার এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা পল্লী এলাকার অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।

সারণি ২

অঞ্চল ভেদে আমানত ও অগ্রিম এর ধারা, ১৯৯১-২০১৩

(বিলিয়ন টাকায়)

বছর	শহর			গ্রাম			মোট		
	আমানত	অগ্রিম	অগ্রিম-আমানত অনুপাত (%)	আমানত	অগ্রিম	অগ্রিম-আমানত অনুপাত (%)	আমানত	অগ্রিম	অগ্রিম-আমানত অনুপাত (%)
১৯৯১	১৯৭.৩	১৭৬.৯	৮৯.৭	৫৩.৩	৪২.২	৭৯.১	২৫০.৬	২১৯.১	৮৭.৪
২০০০	৫৪৯.২	৪৯৩.৫	৮৯.৯	১৬০.৬	১০০.১	৬২.৩	৭০৯.৮	৫৯৩.৬	৮৩.৬
২০০৫	১১৯৭.৮	৯৯৯.৭	৮৩.৫	২১৮.৩	১১৭.৬	৫৩.৯	১৪১৫.৯	১১১৭.৩	৭৮.৯
২০১০	২৯৪২.৩	২৩৬৭.৫	৮০.৫	৪৩৬.৯	২০৬.৯	৪৭.৪	৩৩৭৯.২	২৫৭৪.৪	৭৬.২
২০১২	৪০১১.০	৩৪৫৩.৭	৮৬.১	৮৫৩.১	৪০৫.৬	৪৭.৫	৪৮৬৪.১	৩৮৫৯.৩	৭৯.৩
২০১৩	৪৯৮৮.২	৩৯৮৭.৮	৭৯.৯	১১১৭.১	৪৫০.৬	৪০.৩	৬১০৫.৩	৪৪৩৮.৪	৭২.৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

অধিকন্তু বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে বাস্তবতা হলো এই যে, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের প্রান্তিক পরিবারগুলোর আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা প্রাপ্তির কম সুযোগ রয়েছে। ফলে আধা-আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের পিছনে প্রধান উপাদান হলো দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে আর্থিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ প্রদানে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সত্তরের দশক থেকে পল্লী এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। এসব উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলো দরিদ্রদের জন্য ঋণসহ অন্যান্য উন্নয়ন উপকরণের সরবরাহে সহায়তা করা। এটা ধারণা করা হয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্রদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করতে পারে। ইত্যবছরে দেশের বিভিন্ন এনজিও, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও অন্যান্য, এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অতি দরিদ্র ও অপরাপর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল মডেলও উদ্ভাবিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন এনজিওর সংখ্যা, শাখার সংখ্যা ও সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত দেশে কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো ছিল না। দেশে কার্যরত ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সরকার ২০০৬ সালে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (MRA) প্রতিষ্ঠা করে। এ সংস্থা থেকে লাইসেন্স নিয়ে বর্তমানে দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে (MoF 2014)। সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে, ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ৫৭৬টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থার ১৮,০৬৬টি শাখায় মোট সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬.০৮ মিলিয়ন।[৬] সদস্য সংখ্যা গণনায় কিছুটা উর্ধ্বমুখী পক্ষপাত থাকলেও সংশ্লিষ্ট তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির ব্যাপ্তি ও মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ৩

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রসার-সীমা

বছর	লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা (মিলিয়ন)
২০০৯	৪১৯	১৬,৮৫১	২৪.৮৫
২০১০	৫১৬	১৭,২৫২	২৫.২৮
২০১১	৫৭৬	১৮,০৬৬	২৬.০৮
২০১২	৫৯০	১৭,৯৭৭	২৪.৬৪
২০১৩	৬৪৯	১৪,৬৭৪	২৪.৬০

উৎস: এমআরএ।

এ খাতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কের বিস্তৃতিই লক্ষ করা যায় তাই নয় অধিকন্তু ঋণ বিতরণের পরিমাণ এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিও লক্ষ করা যায় (সারণি ৪)। ২০১১ সালের শেষ নাগাদ ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৯০ বিলিয়ন টাকা যা উক্ত বছরে মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৬৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এধরনের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে একাধিক উৎস থেকে ঋণগ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত। তবে সারণিতে প্রদত্ত উপাত্ত দেশে ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চ বিস্তৃতিকেই প্রতিফলিত করে। গ্রাম-শহর বিভাজনভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ সেবার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি (সারণি ৫)। এ থেকে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের ঋণের ৮৯ শতাংশের বেশি বিতরিত হয়েছে পল্লী এলাকায় এবং মোট ঋণ স্থিতির ৯০ শতাংশই পল্লী ঋণ। এ থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে, পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। সারণিতে প্রদত্ত উপাত্ত এটাই নির্দেশ করে যে, ক্ষুদ্র ঋণে দরিদ্র পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়।

[৬]কিন্তু এ সংখ্যাগুলোকে সতর্কতার সাথে হিসাবে নেয়া দরকার কেননা এমএফআই কর্তৃক দেয়া হিসাবে একই ব্যক্তিকে একাধিক বার বা একই ব্যক্তির একাধিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ একাধিক গণনার নানা রূপ আছে যেমন যুগপৎ সদস্যপদ, একই প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক ঋণ গ্রহণ এবং বাদ পড়ে যাওয়া (ড্রপ আউট) সদস্যদেরকে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা। একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যুগপৎ ঋণ গ্রহণের হার ৪২ শতাংশ। একই সমীক্ষা প্রকৃত সদস্য সংখ্যা ২০০৯ সালে ২০ মিলিয়নের বেশি হবে না বলে মন্তব্য করেছে যখন উল্লেখিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫.৭১ মিলিয়ন। একই সমীক্ষা অনুসারে ২০০০ সালে এধরনের যুগপৎ (Overlapping) সদস্যপদের হার ছিল ৮.৬ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৩১ শতাংশ (দেখুন Khalily 2013)।

সারণি ৪
ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ

বছর	বার্ষিক বিতরণ (বিলিয়ন টাকায়)	ঋণের মোট স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)	বিতরণের শতাংশ হিসেবে স্থিতি ঋণ	স্থিতি সংখ্যা ঋণগ্রহীতা (মিলিয়ন)
২০০০	৩৩.২	২১.৯	৬৬.০	৭.৯
২০০৫	৯২.৬	৫৫.৭	৬০.১	১৩.৯
২০০৮	৩১১.১	১৩৪.৭	৪৩.৩	১৭.৮
২০০৯	৩৭০.৮	১৪৩.১	৫১.০	১৮.৯
২০১০	৩৮৩.৬	১৪৫.০	৩৮.৬	১৯.২
২০১১	৪০৬.২	২৪৬.১	৬০.৬	২৯.০
২০১৩	৫৫৩.১	৩৪০.৯	৬১.৬	২৭.৭

উৎস: Institute of Microfinance (InM)।
টীকা: ২০০০ ও ২০০৫ সালের উপাত্তে গ্রামীণ ব্যাংকের উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি ৫
পল্লী ও শহর এলাকায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নির্বাচিত তথ্য, ২০১১

	পল্লী এলাকা	শহর এলাকা	মোট
সঞ্চয় প্রবণতা			
নিট সঞ্চয় (বিলিয়ন টাকা)	১৭৫.৯	১০.২	১৮৬.২
এমএফআইয়ের ঋণগ্রহীতা			
সক্রিয় ঋণগ্রহীতা (মিলিয়ন)	২৪.৭	২.৪	২৭.২
ঋণ বিতরণ ও আদায়			
ঋণ বিতরণ (বিলিয়ন টাকা)	৩৯৩.৭	৪৬.৫	৪৪০.৩
ঋণ আদায় (বিলিয়ন টাকা)	৩৮২.৬	৪৮.৪	৪৩১.১
ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকা)	২৫০.৯	২৮.৯	২৭৯.৮

উৎস: InM and CDF (2012)।
টীকা: বিতরণ ও আদায়ের অংক কাছাকাছি হওয়া এটা বোঝায় না যে কোনো একটি বছরে বিতরণকৃত সকল ঋণ পরিশোধিত হয়েছে। আদায় অংকের অন্তর্ভুক্ত হলো পূর্বের ঋণ পরিশোধ। এজন্য কোনো বছরে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ বিতরণকৃত ঋণের চাইতে বেশি হতে পারে।

আর্থিক সেবার উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানের অগ্রিম-আমানত অনুপাত বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ক্রমহ্রাসমান যার ফলে আনুষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে পল্লী বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। অগ্রিম-আমানতের ক্রমহ্রাস মানে পল্লী এলাকায় ঋণ সেবার কম চাহিদা রয়েছে তা নয় কেননা পল্লী এলাকায় আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। দেশের প্রায় ৬৪৯টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের ১৪,৬৭৪ শাখার ২৪.৬ মিলিয়নের বেশি ঋণগ্রহীতা রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রায় ৯০ শতাংশই গ্রাম এলাকায় পরিচালিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সীমিত হলেও দেশব্যাপী ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের বিস্তৃতির মাধ্যমে আর্থিক সেবায় পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২.২। আর্থিক সেবা প্রাপ্তি : বর্তমান পরিস্থিতি

আর্থিক সেবা কার্যক্রমের প্রসার-সীমা এবং আর্থিক সেবার প্রকৃত ব্যবহার এ দুটো নির্দেশক থেকে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আর্থিক সেবায় সার্বিক অন্তর্ভুক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাংক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি

ভৌগোলিক বা অবস্থানগত নিবিড়তা সূচক অনুযায়ী প্রতি হাজার কিলোমিটারে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০০৫ সালের ৪৪.২ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৫৩.৩ এ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে প্রতি হাজার কিলোমিটারে এটিএম বুথের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়েছে—২০০৫ সালের ০.৮ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ১৪.৪ হয়েছে (Islam and Mamun 2011)। জনমিতি নিবিড়তার দিক দিয়ে প্রতি লাখ মানুষে ব্যাংক শাখার সংখ্যা ২০০৫ সালের ৪.৭ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৫.৩ হয়েছে। একইভাবে প্রতি লাখ মানুষে এটিএম বুথের সংখ্যা ২০০৫ সালে ০.১ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ১.৪ হয়েছে। ভৌগোলিক ও জনমিতি নিবিড়তা সূচকের এসব প্রবণতা এটাই নির্দেশ করে যে, ব্যাংক সেবায় জনগণের অন্তর্ভুক্তি ইদানিং দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

দেখা যায় যে, ব্যাংক শাখার সম্প্রসারণ, আমানত ও ঋণ হিসাবের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যাংক সেবায় জনগণের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক ব্যাংক সেবা প্রাপ্তি গত দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-২০১০ সালে যেখানে পল্লী এলাকার মোট ব্যাংক শাখা বছরে গড়ে ৩ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে সেখানে আমানত হিসাবের সংখ্যা একই সময়কালে পল্লী এলাকায় ১২ শতাংশ হারে এবং শহর এলাকায় ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। একই সময়কালে ঋণ হিসাবের সংখ্যা পল্লী এলাকায় ০.৫ শতাংশ হারে বাড়লেও শহর এলাকায় বেড়েছে ৪.৪ শতাংশ হারে (Islam and Mamun 2011)। পল্লী এলাকায় প্রতি হাজার মানুষে আমানত হিসাবের সংখ্যা ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ১২৭ যা ২০১০ সালে হয়েছে ১৮৯ এবং ঋণ হিসাবের সংখ্যা ২০০৫ সালের ৫৩ থেকে সামান্য কমে ২০১০ সালে ৫১ হয়েছে। সার্বিকভাবে আমানত ও ঋণ হিসাবের সংখ্যা প্রতি হাজার মানুষে ২০০৫ সালে ছিল যথাক্রমে ২৪২ ও ৬২ যা বেড়ে ২০১০ সালে যথাক্রমে ৩৩৩ ও ৬৩ হয়েছে। অন্যদিকে আমানত-জিডিপি অনুপাত ২০০৫ সালের ৪২ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৫৩ শতাংশ এবং ঋণ-জিডিপি অনুপাত একই সময়কালে ৩২ থেকে বেড়ে ৪৩ শতাংশ হয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেবা-সহায়তা

বাংলাদেশে এমএফআইয়ের মাধ্যমে আর্থিক সেবায় সহায়তা উল্লেখ করার মতো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে মোট ৬৪৯টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমএফআই এর ১৪,৬৭৪টি শাখার মাধ্যমে ২৪.৬ মিলিয়ন গ্রাহক আর্থিক সেবা পাচ্ছে। এসব গ্রাহকের বিরাট অংশই মহিলা। এমএফআইয়ের মাধ্যমে আহরিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০০৮ সালের ৪৭.৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে ২২৬.২ বিলিয়ন টাকায় এবং মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ একই বছরে ৫৫৩.১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়।

ভৌগোলিক নিবিড়তা, প্রতি হাজার কিলোমিটারে ব্যাংক শাখার সংখ্যা বিচারে, ২০০৭ সালের ৯৩ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ১২৪টি হয়। জনসংখ্যা নিবিড়তা অনুপাত এটাই নির্দেশ করে যে, ২০০৭ সালে যেখানে প্রতি লাখ মানুষে শাখা ছিল ৯.৬টি তা ২০১১ সালে বেড়ে হয়েছে ১২.১টি (Islam and Mamun 2011)।

সার্বিক আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি

আর্থিক সেবায় সার্বিক প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৬ এ দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যায় যে, আর্থিক সেবা-সহায়তায় জনগণের অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি একটা স্থিতিশীল ও মাঝামাঝি

অবস্থাকেই নির্দেশ করে। মোট জনসংখ্যার অংশ হিসেবে সার্বিক আর্থিক সেবা প্রাপ্তি ২০০৫ সালের ৪৩.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৫৬.৪ শতাংশ হয়েছে। মোট বয়স্ক জনসংখ্যার অংশ হিসেবে একই সময়কালে সার্বিক আর্থিক সেবা প্রাপ্তি ৭১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৭.২ শতাংশ হয়েছে আর তা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার কারণে।

সারণি ৬

আর্থিক সেবা-সহায়তার ধারা

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		শাখা প্রতি জনসংখ্যা (হাজারে)	ব্যাংক আমানত হিসাবধারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	বয়স্ক মানুষের শতাংশ হিসেবে আমানত হিসাবের সংখ্যা	এমএফ-আইয়ের মোট সদস্য সংখ্যা (মিলিয়ন)	বয়স্ক মানুষের শতাংশ হিসেবে এমএফআই সদস্য	সমবায় সমিতিতে সদস্য সংখ্যা (মিলিয়ন)	বয়স্ক মানুষের শতাংশ হিসেবে সমবায় সমিতির সদস্য	আর্থিক সেবা প্রাপ্তি (%)	
	মোট	বয়স্ক								বয়স্ক জন সংখ্যা	মোট জন সংখ্যা
২০০০	১১১.৫	৭৫.২	১৮.৪	২৮.৪	৩৭.৮	‹	...	...	...	...	...
২০০৫	১৩৭.০	৮৩.৮	২১.৪	৩৩.১	৩৯.৫	১৮.৮২	১৮.৮	৭.৯	৯.৫	৭১.৪	৪৩.৭
২০০৮	১৪২.৪	৮৯.৬	২০.৬	৩৭.৬	৪৩.৮	২৩.৫৩	২৩.৫	৮.৪	৯.৮	৭৭.৬	৪৮.৯
২০০৯	১৪৪.২	৯২.২	১৯.৭	৩৮.৭	৪২.৩	২৪.৯০	২৪.৯	৮.৬	৯.৪	৭৮.৬	৫০.৩
২০১০	১৪৬.১	৯৪.৫	১৯.০	৪৮.৭	৫১.৫	২৪.৯৪	২৪.৯	৮.৮	৯.৩	৮৭.২	৫৬.৪
২০১৩	১৫৩.৭	৯৯.৪	১৭.৭	৬৬.৬৮	৬৭.১	২৪.৬০	২৪.৮	৯.৩	৯.৪	১০১.২	৬৫.৪

উৎস: Islam and Mamun (2011), BBS (2013)।

২.৩। আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তিতে আঞ্চলিক পার্থক্য

২০০৯ সালে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইনান্স (আইএনএম) প্রধান প্রধান আর্থিক সেবার (সঞ্চয়, ঋণ ও বীমা বা ইন্স্যুরেন্স) উপর একটি বিস্তারিত জাতীয় জরিপ পরিচালনা করে। এ জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ৭৭ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের আর্থিক সেবাভুক্ত (সারণি ৭)[৭] ছিল তবে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্ত ছিল মাত্র ৩৭ শতাংশ খানা, আধা-আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্ত ৪৩.২ শতাংশ খানা এবং অনানুষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্ত ছিল ২৬.২ শতাংশ খানা।

অধিকন্তু প্রশাসনিক বিভাগ ভেদে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগে আধা-আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা তুলনামূলকভাবে বেশি (যথাক্রমে ৫৩.৩ ও ৫৬.২ শতাংশ)। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় (যথাক্রমে ৪১.১ ও ৪২.৭ শতাংশ)। আধা-আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের নিবিড়তা বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিক বাজারের আকার এখনও অনেক বড়। খুলনা ও ঢাকা বিভাগ ব্যতীত সকল বিভাগেই যেকোনো ধরনের অনানুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ বেশি।

উপরোক্ত জরিপ থেকে আরও দেখা যায় যে, দরিদ্র ও পল্লী এলাকার পরিবারগুলোতে আধা-আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবায় অন্তর্ভুক্তির হার বেশি (যথাক্রমে ৫২.৭ ও ৪৬.৭ শতাংশ)। পক্ষান্তরে

[৭] রাঙামাটি জেলা ব্যতিত দেশের সকল এলাকা এ জরিপভুক্ত ছিল। জরিপভুক্ত মোট খানার সংখ্যা ছিল ৮,৯৩৬টি, যার মধ্যে গ্রামীণ খানা ছিল ৬,৬৩৬টি এবং শহুরে খানা ছিল ২,৩০০টি।

অদরিদ্র ও শহুরে পরিবারগুলোতে আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বেশি (যথাক্রমে ৪৪.৪ ও ৫৩.৫ শতাংশ)। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই কারণ এমএফআইগুলো মূলত গ্রাম এলাকার দরিদ্রদেরকেই সেবা দিয়ে থাকে এবং আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ লাভের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত পূরণের সামর্থ্য অদরিদ্রদেরই বেশি রয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, যদিও প্রায় ৫২ শতাংশ দরিদ্র পরিবার আধা আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবাভুক্ত, অদরিদ্র পরিবারগুলোর প্রায় ৪০ শতাংশও এ সেবাভুক্ত। আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারে অদরিদ্রদের এ উচ্চ উপস্থিতির কারণ হতে পারে দুটো: প্রথমত, অদরিদ্র পরিবারগুলো দরিদ্রদের জন্য নেয়া টার্গেটেড কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করে, এবং দ্বিতীয়ত, দরিদ্র পরিবারগুলো কর্তৃক আধা-আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান সুযোগ প্রাপ্তির কারণে দারিদ্র্য থেকে তাদের উত্তরণ ঘটার পরও তারা আর্থিক সেবা ব্যবহার করতে পছন্দ করে।[৮]

ঋণ, সঞ্চয় ও বীমা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট আর্থিক সেবাকে বিবেচনায় নিলে জরিপ থেকে দেখা যায় যে, যেকোনো ধরনের আর্থিক বাজার থেকে প্রায় ৫৭ শতাংশ খানা সঞ্চয় সেবা এবং ৫৪.১ শতাংশ খানা ঋণ সেবা-সহায়তা পেয়ে থাকে (সারণি ৮)। সকল ধরনের বাজার থেকে সম্পদ আহরণের নিমিত্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এর ব্যাপক উদ্যোগের কারণে সঞ্চয় সেবা-সহায়তার হার উচ্চ হয়ে থাকে। জরিপের ফলাফল থেকে আরও দেখা যায় যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তুলনামূলকভাবে বৃহৎ সংখ্যক সঞ্চয়কারী থেকে সঞ্চয় আহরণ করলেও তারা ক্ষুদ্র সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে ঋণ সেবা দিয়ে থাকে। ইন্স্যুরেন্স সেবার পরিধি খুবই সীমিত, মাত্র ১১.১ শতাংশ খানা এ সেবাভুক্ত।

সারণি ৭

বাংলাদেশে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি, ২০০৯-১০

(শতকরা হারে)

এলাকা	যেকোনো আর্থিক বাজার থেকে যেকোনো ধরনের সেবা প্রাপ্তি	যেকোনো আর্থিক সেবা প্রাপ্তি (বীমা বাদে)	আধা-আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবা প্রাপ্তি	আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা প্রাপ্তি	অনানুষ্ঠানিক অর্থায়ন সেবা প্রাপ্তি
জাতীয়	৭৬.৮	৭৩.৪	৪৩.২	৩৭.০	২৬.২
বিভাগ					
বরিশাল	৮০.৬	৭৭.২	৫৩.৩	৩৭.৯	২৯.৩
চট্টগ্রাম	৭৮.৬	৭৫.১	৩৬.১	৪১.৭	৩৩.৬
ঢাকা	৭৮.৯	৭৬.১	৪১.৪	৪১.১	২২.২
খুলনা	৬৩.৮	৫৬.৫	৩৫.৪	৩৬.৬	১২.০
রাজশাহী	৭৯.৭	৭৭.১	৫৬.২	২৮.৭	৩২.১
সিলেট	৭০.৩	৬৮.৭	২৪.৭	৩৫.৫	৩০.৬
দারিদ্র্য পরিস্থিতি					
অদরিদ্র	৭৯.৪	৭৬.০	৩৯.৭	৪৪.৪	২১.৭
দরিদ্র	৭০.৬	৬৭.১	৫১.৭	১৯.৪	২৭.৪
এলাকা					
গ্রাম	৭৫.৫	৭১.৯	৪৬.৪	৩২.৮	২৭.৪
শহর	৮১.৭	৭৯.০	৩০.৯	৫৩.৫	২৩.৬

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

[৮] মিস টার্গেটিং বিষয়ে কেউ কেউ এ যুক্তি দিতে পারেন যে এসব অদরিদ্র পরিবার আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার থেকে আর্থিক সেবা-সহায়তা পেয়ে থাকে। যদি এ বাজারে তাদের প্রবেশ না থাকতো তাহলে এসব খানা বা পরিবার আর্থিক ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

জরিপ থেকে দেখা যায়, অদরিদ্র পরিবারের (৫২.১ শতাংশ) চেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর (৫৯ শতাংশ) ঋণ সেবা প্রাপ্তির হার বেশি। পক্ষান্তরে দরিদ্র পরিবারগুলোর (সঞ্চয় ৪৭ শতাংশ, ইন্স্যুরেন্স ৭.৩ শতাংশ) চেয়ে অদরিদ্র পরিবারগুলোর সঞ্চয় ও ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রাপ্তির হার (সঞ্চয় ৬০.৫ শতাংশ, ইন্স্যুরেন্স ১২.৭ শতাংশ) বেশি। আরও দেখা গেছে, শহরের পরিবারগুলো সঞ্চয় বেশি করে থাকে (৬৬.৭ শতাংশ) এবং গ্রাম এলাকার পরিবারগুলো ঋণ বেশি করে থাকে (৫৬.২ শতাংশ)। এই শহর-গ্রাম পার্থক্য শহর এলাকায় আনুষ্ঠানিক বাজারের ব্যাপকতর বিস্তার এবং গ্রাম এলাকায় আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারের উচ্চ উপস্থিতির সাথে যুক্ত। সরকার ও এনজিও কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ব্যাপক বিস্তার এবং এমএফআইয়ের বিস্তার নি:সন্দেহে আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে দরিদ্র ও পল্লী এলাকার পরিবারগুলোর উচ্চ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করেছে। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় সঞ্চয় সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে তুলনামূলকভাবে উচ্চ। অন্যদিকে ঋণ সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগে বেশি লক্ষ করা যায়।

সারণি ৮

বাংলাদেশে কতিপয় আর্থিক সেবা প্রাপ্তি, ২০০৯-১০

এলাকা	ঋণ সেবা প্রাপ্তি	সঞ্চয় সেবা প্রাপ্তি	বীমা সেবা প্রাপ্তি
জাতীয়	৫৪.১	৫৬.৫	১১.১
বিভাগ			
বরিশাল	৬৬.৪	৪২.৫	১৪.৪
চট্টগাম	৪৮.২	৬০.৪	১৩.৩
ঢাকা	৫০.৬	৬০.৮	১০.৪
খুলনা	৪১.১	৩৫.৫	১৫.৭
রাজশাহী	৬৮.৫	৬৪.০	৮.১
সিলেট	৪৫.৪	৪৭.৮	৮.৫
দারিদ্র্য পরিস্থিতি			
অদরিদ্র	৫২.১	৬০.৫	১২.৭
দরিদ্র	৫৯.০	৪৭.০	৭.৩
এলাকা			
গ্রাম	৫৬.২	৫৩.৯	১০.৯
শহর	৪৬.১	৬৬.৭	১১.৯

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

৩। দরিদ্রদের জন্য ঋণ সেবা-সহায়তা

অধিকতর আয় বর্ধনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে অকৃষিজ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়িয়ে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য ঋণ সেবা-সহায়তা প্রাপ্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর অনেকেই আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা-সহায়তার আওতার বাইরে রয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগই গ্রাম এলাকায় বাস করে। ঋণ সেবা-সহায়তা দরিদ্র পরিবারগুলোর তহবিল সংকট দূর করার পাশাপাশি উৎপাদন ঝুঁকি কমানো এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে (উন্নতমানের উৎপাদন উপকরণ লাভ ও উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে) সহায়তা করে (Eswaran and Kotwal 1990, Zeller *et al*. 1997)। এছাড়া ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তারা ঝুঁকি বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশলে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে ও ভোগ স্থিতিশীল (smoothening) করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

দরিদ্র জনগণের ঋণ চাহিদা পূরণে আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে এমএফআইগুলোর আবির্ভাব ঘটে বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের ঋণ সেবা-সহায়তা প্রদানের জন্য। আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজার নানাবিধ কারণে দরিদ্রদেরকে পর্যাপ্ত ঋণ সেবা-সহায়তা প্রদান করতে পারে না, যেমন ঋণ জামানত দেয়ার সামর্থ্য না থাকা, ঋণগ্রহীতাদের আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধান থাকা, ঋণের পরিমাণ ছোট হওয়া এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন খরচ অত্যধিক হওয়া। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ কম হওয়া, ঋণের সুদ উচ্চ হওয়া ইত্যাদি কারণে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজার দরিদ্রদেরকে সেবা-সহায়তা দিতে পারে না। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের পৃথক ও বিশেষ ধরনের ক্লায়েন্ট গ্রুপ রয়েছে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের প্রধান ঋণগ্রহীতা হচ্ছে অদরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের জামানত দেয়ার বা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি দেয়ার সামর্থ্য রয়েছে। আনুষ্ঠানিক বাজারের বাইরে থাকা দরিদ্ররা হচ্ছে আধা-আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের প্রধান গ্রুপ। আর যারা আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারের বাইরে রয়েছে তারা অনানুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের প্রধান গ্রুপ। অধিকন্তু আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারের ঋণগ্রহীতারা তাদের আকস্মিক ও জরুরি প্রয়োজন মেটাতে এবং এ বাজার থেকে ঋণ সেবা গ্রহণ সুবিধাজনক ও নমনীয় হওয়ায় প্রায়শ অনানুষ্ঠানিক বাজার থেকে ঋণ সেবা গ্রহণ করে থাকে।

দেশের ঋণ সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির সার্বিক চিত্র সারণি ৯-এ দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, ৫৪.১ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনো ধরনের ঋণ সেবা-সুবিধা পেয়ে থাকে যেখানে ১২ শতাংশ পরিবার একাধিক উৎস থেকে বা যুগপৎ ঋণ সেবা-সহায়তা পেয়ে থাকে। জরিপের তথ্য থেকে আরও দেখা যায়, একাধিক উৎস থেকে ঋণ সেবা গ্রহণের হার ২১ শতাংশ এবং ৪৭ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবাগ্রহীতা ও ৪০ শতাংশ আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা গ্রহীতা অন্যান্য ঋণ বাজার থেকেও ঋণ সেবা গ্রহণ করে থাকে (Khalily and Khaleque 2013)।

সারণি ৯

বাংলাদেশে ঋণ সেবা প্রাপ্তি, ২০০৯-১০

এলাকা	যেকোনো ধরনের ঋণ সেবা প্রাপ্তি	আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা প্রাপ্তি	আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা প্রাপ্তি	অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা প্রাপ্তি	কোনো ঋণ সেবা প্রাপ্তি নেই
জাতীয়	৫৪.১	৩৬.৬	৮.০	২১.৮	৪৫.৯
বিভাগ					
বরিশাল	৬৬.৪	৫০.৩	১৬.৭	২৭.১	৩৩.৬
চট্টগ্রাম	৪৮.২	২৪.৭	৬.৫	২৭.৮	৫১.৮
ঢাকা	৫০.৬	৩৩.৩	৮.১	১৭.৩	৪৯.৪
খুলনা	৪১.১	৩১.২	৯.৪	৮.৭	৫৮.৯
রাজশাহী	৬৮.৫	৫১.৫	৭.০	২৮.০	৩১.৫
সিলেট	৪৫.৪	২৩.৭	৩.৯	২৭.২	৫৪.৬
দারিদ্র্য পরিস্থিতি					
অদরিদ্র	৫২.০৮	৩২.৯	৯.১	২২.৩	৪৭.৯
দরিদ্র	৫৮.৯৭	৪৫.৪	৫.৪	২০.৬	৪১.০
এলাকা					
গ্রাম	৫৬.২	৩৯.১	৭.৬	২৩.১	৪৩.৮
শহর	৪৬.১	২৭.০	৯.৬	১৬.৮	৫৩.৯

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

এই জরিপ ফলাফল থেকে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে মাত্র ৮ শতাংশ পরিবার আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবাভুক্ত। এই চিত্র গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। শহর এলাকার ১০ শতাংশের কম পরিবার এবং গ্রাম এলাকার ৭.৬ শতাংশ পরিবার আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা-সহায়তাভুক্ত। দারিদ্র্য অবস্থা বিবেচনায় অদরিদ্রদের ৯.১ শতাংশ এবং দরিদ্রদের ৫.৪ শতাংশ আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা-সহায়তা পেয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বরিশাল বিভাগে আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা-সহায়তা গ্রহণের হার সর্বোচ্চ (১৬.৭ শতাংশ), এর পরেই রয়েছে খুলনা (৯.৪ শতাংশ) ও ঢাকা বিভাগের অবস্থান (৮.১ শতাংশ)।

আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা-সহায়তা গ্রহণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় ঋণের উৎস হিসেবে আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারের প্রাধান্য রয়েছে। গ্রাম এলাকায় এ বাজারের প্রাধান্য ৩৯.১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় তা ২৭ শতাংশ। দরিদ্র ও অদরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারের উপস্থিতিও বেশি। জরিপ থেকে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারগুলোর ৪৫.৪ শতাংশ এবং অদরিদ্র পরিবারের ৩২.৯ শতাংশ আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার থেকে ঋণ সেবা-সহায়তা পায়। বিভাগীয় পর্যায়েও একথা সত্য তবে একই মাত্রা বা হারে নয়। বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের ৫০ শতাংশের বেশি খানা আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার থেকে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের যথাক্রমে প্রায় ২৫ ও ২৪ শতাংশ খানা আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার থেকে ঋণ সেবা-সহায়তা পেয়ে থাকে।

আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার দ্রুত প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিক ঋণের গুরুত্ব এখনও রয়ে গেছে। দেশের প্রায় ২২ শতাংশ খানা অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা নিয়ে থাকে। দরিদ্র ও অদরিদ্র খানার এক পঞ্চমাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা এবং গ্রাম এলাকার ২৩.১ শতাংশ দরিদ্র খানার বিপরীতে শহর এলাকার প্রায় ১৭ শতাংশ খানা অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা নিয়ে থাকে। ঢাকা ও খুলনা বিভাগ ব্যতীত সকল বিভাগে ২৭ শতাংশের বেশি খানা অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা নিয়ে থাকে।

ঋণগ্রহণকারী খানার বিবেচনায় চিত্রটা একই রকম। জরিপ অনুসারে ৫৫ শতাংশ খানা যেখানে আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা গ্রহণের কথা বলেছে সেখানে ৩৩ শতাংশ বলেছে অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবা গ্রহণের কথা। ঋণ গ্রহণকারী খানাগুলোতে আনুষ্ঠানিক ঋণ সেবা-সহায়তা গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১২ শতাংশ।

ঋণ গ্রহণকারীদের কাছে মোট বিতরণকৃত ঋণের তিনটি প্রধান আর্থিক বাজারের অংশ সারণি ১০-এ দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যায় যে, মোট বিতরণকৃত ঋণে আনুষ্ঠানিক ঋণের অংশ ২৪ শতাংশ এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণের অংশ ৪০ শতাংশ। আরও লক্ষ করা যায় যে, মোট বিতরণকৃত ঋণে আনুষ্ঠানিক ঋণের অংশ শহর এলাকার চেয়ে গ্রাম এলাকায় বেশি (৪১.৯ বনাম ১৩.৩ শতাংশ)। একইভাবে অনানুষ্ঠানিক ঋণের অংশ গ্রাম ও শহর এলাকায় যথাক্রমে ৪৫.৩ ও ২৯.৫ শতাংশ। জাতীয় পর্যায়ে আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণের অংশ ৩৭ শতাংশ, গ্রাম ও শহর এলাকার ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৪১ ও ২৮ শতাংশ। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণের চেয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ঋণের গড় আকার তুলনামূলকভাবে বেশি। এ ফলাফলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো যে, আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক উভয় ঋণ বাজারে গ্রাম এলাকার পরিবারগুলো এখনো ঋণ সংকটে ভুগছে।

সারণি ১০

মোট ঋণের পরিমাণে বিভিন্ন আর্থিক বাজারের অংশ, ২০০৯-১০

(শতকরা হিসেবে)

বাজার	মোট	গ্রাম	শহর
আনুষ্ঠানিক ঋণ	২৩.৯	১৩.৩	৪১.৯
আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ	৩৬.৬	৪০.৭	২৮.২
অনানুষ্ঠানিক ঋণ	৩৯.৮	৪৫.৩	২৯.৫

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

৩.১। আর্থিক সেবা প্রাপ্তি প্রসারের বর্তমান পরিস্থিতি ও অন্তরায়সমূহ

আর্থিক সেবা-সহায়তা সহায়ক নীতিকৌশল প্রণয়নকল্পে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিতে আবশ্যকীয় আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির পথে যেসব অন্তরায়/প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ ছাড়াও ঋণের সহজলভ্যতা ও ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কেননা এগুলোতে আর্থিক সেবা প্রাপ্তির পথে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়।

এ প্রেক্ষিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হলো অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং অবকাঠামো। দেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহদাংশ আর্থিক সেবার আওতা বহির্ভূত (দেশের বয়স্ক মানুষের প্রায় অর্ধেক ব্যাংকিং সেবাভুক্ত নয়)। আমানত হিসাবের দিক থেকে অন্যতম বাধা হলো ভৌগোলিক ও ভৌত সুবিধা কম যেমন ব্যাংকের শাখা থেকে খানার গড় দূরত্ব বেশি হওয়া। উদাহরণস্বরূপ প্রতি লাখ মানুষে বর্তমানে ৭টির চেয়ে কম এবং প্রতি হাজার কিলোমিটারে ৬৭টি ব্যাংকের শাখা রয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, দেশের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের আর্থিক সেবা লাভের কোনো ফিজিক্যাল একসেস নেই যারা দেশের পল্লী এলাকায় ও দুর্গম অঞ্চলে বাস করে।

আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো আর্থিক সেবা পেতে পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, রেফারেন্স পত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হয় যা অনেক মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। জনগণ বিশেষ করে পল্লী এলাকার বেশিরভাগ মানুষের আর্থিক বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতার স্তর নিচু, যার ফলে পরিবারগুলোর এক বৃহদাংশের পক্ষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আর্থিক সেবা লাভ কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক ব্যাংকেই ব্যাংক হিসাব খুলতে ন্যূনতম স্থিতি (balance) রাখা বা ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষের অনেকেরই এ রকম স্থিতি না থাকায় আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। হিসাব খুলতে যে পরিমাণ স্থিতি রাখতে হয় তা পরিমাণে কম হলেও আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগণের প্রবেশ বাড়াতে এরূপ বাধ্যবাধকতা/শর্ত তুলে নেয়া দরকার।

ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবসার কৌশল হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় আকারের ঋণের উপর জোর দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় মূল ধারার ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্ষুদ্র আকারের ঋণ (এসএমই ও কৃষি ঋণসহ) কম অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের এক বিরাট অংশের পক্ষে ঋণ সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা-বান্ধব প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের প্রসার এসব গ্রুপের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি ও সেবার ব্যবহার বাড়াতে পারে। দরিদ্র ও গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের

আয় স্তর কম হওয়ায় তারা আর্থিক সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। এছাড়া এসব গ্রুপের জন্য ব্যাংক ও এমএফআইগুলোর যথোপযুক্ত সেবা-পণ্যের অভাব রয়েছে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ব্যাংক সেবা বহির্ভূত ও স্বল্প আয়ের মানুষদেরকে আর্থিক সেবা লাভে সক্ষম করার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক সেবা পণ্যের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবা প্রাপ্তির পথে আরেকটা প্রধান বাধা হলো সেবা-পণ্যের উচ্চ খরচ বিশেষ করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সেবাপণ্যের খরচ। ক্ষুদ্র ঋণ অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম-প্রসার (outreach) বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় চিত্তাকর্ষক হলেও যুগপৎ ঋণগ্রহীতা ও তাদের ঋণগ্রস্থতাকে চিহ্নিতকরণে সহায়ক কোনো ক্রেডিট ব্যুরো নেই। একই সাথে ঋণগ্রহীতাদের জন্য ক্ষুদ্র বীমারও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

দেশে স্থিতিশীল আর্থিক ও মুদ্রা খাত নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতিকে অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীর যেসব অংশ ও অর্থনীতির যেসব খাত ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না তাদেরকে ঋণ সেবা-সহায়তাভুক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অনুসরণের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এসএমই উদ্যোক্তা, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ ও শহুরে কৃষিজ ও অকৃষিজ উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের, যারা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে 'মিসিং মিডল' হিসেবে বিবেচিত, ঋণ সেবা-সুবিধা প্রদান বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের নীতি অগ্রাধিকারও বটে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বিস্তৃত ও গভীরতর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য অন্যান্য ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিচ্ছে। অন্য কথায় এসব উদ্যোগ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এসব নতুন গ্রাহকদের জন্য উৎপাদনশীল ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সৃজনশীল ব্যয়-সাশ্রয়ী অংশীদারিত্ব ও প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রবর্তনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অনানুষ্ঠানিক ঋণ সেবায় বিভিন্ন খানার উচ্চ অন্তর্ভুক্তির কারণ নানাবিধ: অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারের সুবিধা যেমন নমনীয়তা, নৈকট্যতা, সহজে ঋণ প্রাপ্তি এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণের অন্যান্য অনুপম বৈশিষ্ট্য; আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদা পূরণ না হওয়া, এবং একই ধরনের অন্যান্য কারণ। সুতরাং নীতি প্রেক্ষিত থেকে দুটো প্রধান গ্রুপ রয়েছে যারা ঋণ সুবিধা পায় না। প্রথমত, যেসব খানা ঋণ বাজারের আওতার বাইরে রয়েছে (আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে) এবং দ্বিতীয়ত, সেসব খানা যাদের ঋণের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু কোনো না কোনো কারণে বা প্রতিবন্ধকতার কারণে ঋণ সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না।

ঋণ সেবায় জনগণের কম অন্তর্ভুক্তি এটা বোঝায় না যে ঋণগ্রহণকারী খানাগুলো 'ক্রেডিট কনসট্রেইনড' নয় কেননা ঋণ পেতে যেসব বাধ্যবাধকতা বা শর্ত রয়েছে তা অনেক খানার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। 'ক্রেডিট কনসট্রেইন' এর উপস্থিতি সম্পদের কাম্য ব্যবহার, আয়, উৎপাদনশীলতা ও দারিদ্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে (বিস্তারিত দেখুন Eswaran and Kotwal 1989, 1990, Boucher *et al*. 2009)। ঋণের অতিরিক্ত চাহিদা থাকার পরিস্থিতিতে তথ্যের অসম প্রাপ্তি (information asymmetry) একটা বড় প্রভাবক যা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের রেশনিং আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে যা ঋণদাতাকে ঋণ খেলাপের সম্ভাবনা কমাতে ঋণের রেশনিং গ্রহণ করতে বাধ্য করে (Gonzalez-Vega 1976, Stieglitz and Weiss 1981, Jaffee and Stieglitz 1990)।

লক্ষ করা গেছে যে, ঋণের অতিরিক্ত চাহিদা কমাতে ঋণদাতা মূল্য ও মূল্য বহির্ভুত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। মূল্য রেশনিং তখনই হয় যখন সুদ হার বাড়ানো হয় বা ঋণ চুক্তির শর্ত অধিকতর কঠোর হয়। পক্ষান্তরে মূল্য বহির্ভুত রেশনিং তখন হয় যখন ঋণগ্রহীতারা ঋণ পেতে অধিকতর সুদ হার প্রদানে ইচ্ছুক হয় বা ঋণের রেশনিং মেনে নেয়।

৩.২। ঋণ লেনদেনের খরচ

ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে একটা অন্যতম প্রধান নির্ধারক হলো ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে লেনদেনের খরচ। ঋণ সেবা প্রাপ্তি চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ঋণ লেনদেন খরচের অন্তর্ভুক্ত হলো সুদজনিত ও সুদ বহির্ভূত খরচ। যদি কোনো খামার বা খানার বিভিন্ন ঋণ বাজার থেকে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে প্রতিটা ঋণ বাজারে ঋণ গ্রহণের গড় খরচ কোনো নির্দিষ্ট বাজার থেকে ঋণ সেবা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

ঋণ অনুমোদন ও ঋণদানের পদ্ধতি বিবেচনায় বাংলাদেশের ঋণ বাজারের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত আনুষ্ঠানিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যধিক কাগজপত্র, ঋণ বন্ধকী বা জামানত ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। ফলে এ বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বাজারের চেয়ে ঋণ বহির্ভূত খরচ বেশি পড়ে। অধিকন্তু আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার থেকে ঋণ পাবার সুযোগ সব পরিবারের নেই। অন্যদিকে দেশের প্রায় প্রতিটা গ্রাম বা এলাকায় অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারের উপস্থিতি রয়েছে। এ বাজারে সুদ বহির্ভূত খরচ কম হয়ে থাকে ও সহজে ঋণ পাওয়া যায়। আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজারের উপস্থিতিও ব্যাপক বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় এবং এ বাজারেও সুদ বহির্ভূত খরচ কম হয়ে থাকে।

আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে ধার্যকৃত সুদ হার কম হয়ে থাকে এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে অত্যন্ত চড়া হয়ে থাকে অর্থাৎ অন্যান্য বাজারের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার পরিচালনা ব্যয় উচ্চ হওয়ার কারণে যুক্তিসঙ্গত উচ্চ হারে ঋণ দেয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুদ হার অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারের চেয়ে কম হয়ে থাকে। সুতরাং ঋণের সুদ হার ও প্রত্যাশিত ঋণগ্রহণ বাবদ গড় খরচ ধরে নিলে ঋণ লেনদেনে অন্য দু'ঋণ বাজারের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে অনেক বেশি খরচ পড়ে। তবে ধারণা করা হয় যে, ঋণ গ্রহীতারা সাধারণত আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার থেকেই ঋণ পেতে চায়। বাস্তবে বাজারে ঋণ সেবা পণ্যসমূহ একই রকম নয়। ঋণের আকার ও শর্ত ভেদে তারা ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে খামার বা ব্যক্তি ঋণগ্রহীতারা এমনভাবে আচরণ করে যেন ঋণ লেনদেনের খরচ কম হয়।

Khalily and Khaleque (2013) দেশের বিভিন্ন ঋণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লেনদেন খরচের কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন (সারণি ১১)। সারণি থেকে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে সুদ বহির্ভূত খরচ বেশি হয়ে থাকে তবে গড় সুদ হার কম হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক বাজারের তুলনায় আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারে ঋণ লেনদেন খরচ কম হলেও সুদ হার উচ্চ হয়ে থাকে। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে গড় ঋণ সুদ হার উচ্চতর হয়ে থাকে তবে সুদ বহির্ভূত খরচ আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজারের মাঝামাঝি হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণের সুদ বাবদ খরচ সর্বনিম্ন এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে সর্বোচ্চ হয়ে থাকে তথাপি আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারে ঋণ লেনদেনের খরচ প্রায় কাছাকাছি এবং অনানুষ্ঠানিক বাজারে খরচ সবচেয়ে বেশি পড়ে।

দেখা গেছে, গড় মোট লেনদেন খরচের শতকরা হিসেবে আনুষ্ঠানিক বাজারে সুদ বহির্ভূত খরচ সর্বোচ্চ হয়ে থাকে (১৬.১ শতাংশ)।[৯] পক্ষান্তরে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে সুদ বহির্ভূত খরচ সর্বনিম্ন হয়ে থাকে (৬.৪ শতাংশ)। আর আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারে এ হার ৯.৩ শতাংশ।

সারণি ১১

বিভিন্ন ঋণ বাজারে ঋণ লেনদেনের খরচ, ২০০৯-১০

	ঋণ খরচ (টাকা) প্রতি ১০০ টাকায় ঋণ বাজার		
	আনুষ্ঠানিক	আধা-আনুষ্ঠানিক	অনানুষ্ঠানিক
যাতায়াত খরচ	০.৬১	০.৬২	১.৫৭
ফি বাবদ খরচ	০.৫২	০.৬৯	<
অনানুষ্ঠানিক খরচ (ঘুষ)	১.২০	০.০৩	<
মোট সুদ বহির্ভূত লেনদেন খরচ	২.৩৩	১.৩৪	১.৫৭
সুদ বাবদ খরচ	১২.১৪	১৩.০৭	২২.৯৪
মোট ঋণ গ্রহণ বাবদ খরচ (সুদ+ সুদ বহির্ভূত খরচ)	১৪.৪৭	১৪.৪১	২৪.৫১
মোট লেনদেন খরচের শতাংশ হিসেবে সুদ বহির্ভূত খরচ	১৬.১০	৯.২০	৬.৪০

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

প্রত্যাশিত উৎপাদনের উপর ঋণের উৎপাদনমূলক ব্যবহারের প্রভাব ব্যাপক হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়।[১০] বাস্তবে বেশির ভাগ ঋণগ্রহীতাই ঋণের কিছু অংশ অনুৎপাদনশীল কাজে সম্ভবত ব্যবহার করে থাকে তবে এর মানে এ নয় যে ঋণ উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয় না। এ প্রেক্ষিতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনশীল ফলাফল নির্ভর করবে ঋণের যে অংশ উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর।

সারণি ১২ তে প্রদত্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক ঋণের বেশিরভাগ উৎপাদনশীল কাজে এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও দেখা যাচ্ছে যে, শহর এলাকার তুলনায় গ্রাম এলাকায় উৎপাদনশীল কাজে ঋণ বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণ ব্যবহারে দরিদ্র ও অদরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। তবে অনানুষ্ঠানিক ঋণের বেশিরভাগই অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয়। এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যেহেতু আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ঋণের একটা বড় অংশই

[৯] উচ্চ সুদ বহির্ভূত খরচের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ঘুষ বাবদ খরচ। জরিপ থেকে দেখা গেছে, সুদ বহির্ভূত খরচের ৫০ শতাংশই হচ্ছে ঘুষ তবে আধা-আনুষ্ঠানিক বাজারে এর পরিমাণ অতি নগণ্য। আরও দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠান ভেদে সুদ বহির্ভূত খরচে ভিন্নতা রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে গড় সুদ বহির্ভূত খরচ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তুলনায় কম। সরকারি ব্যাংকসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তুলনায় সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অধিকতর দক্ষ হয়ে থাকে কেননা তাদের সুদ বহির্ভূত খরচ ৫০ শতাংশের কম হয়ে থাকে। এখানে ব্যবধানের কারণ হলো ঘুষ বাবদ খরচ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ঘুষ বাবদ গড় খরচ ঋণের ৩.৭ শতাংশ আর সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ হার ঋণের ১.৩ শতাংশ (বিস্তারিত দেখুন Khalily and Khaleque 2013)।

[১০] উৎপাদনশীল ব্যবহার বলতে সেসব খাতে খরচ বোঝানো হয়েছে যেগুলো আয় সৃজনে, যেমন আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করা, পশুপালন ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ, অবদান রাখে। পক্ষান্তরে অনুৎপাদনশীল ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হলো খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোগে নিয়মিত ব্যয় এবং এ সংক্রান্ত অনিয়মিত ব্যয়। এ ধরনের বিভাজন সমালোচিত হতে পারে এ কারণে যে দারিদ্র্য ও কল্যাণ ভোগের উপরও নির্ভর করে। যেমন ভোগ স্থিতিশীল করতে বা জরুরি প্রয়োজন (অসুস্থতা বা অন্যান্য দুর্যোগ) পূরণে ঋণ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে দারিদ্র্যের উপর। তবে এ আলোচনায় উৎপাদনশীল ব্যবহারকে সেসব কর্মকাণ্ডে সীমিত রাখা হয়েছে যেগুলো সঞ্চয় পুঞ্জিভূতকরণ (accumulation) ও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় সেহেতু বিভিন্ন আর্থসামাজিক ফলাফলের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির অনুকূল প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি ১২

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত মোট ঋণের অংশ, ২০০৯-১০

(শতকরা)

	উৎস	উৎপাদনশীল	অনুৎপাদনশীল
জাতীয়	আনুষ্ঠানিক	৭১.৫	২৮.৫
	আধা-আনুষ্ঠানিক	৬৩.২	৩৬.৮
	অনানুষ্ঠানিক	২৬.৯	৭৩.১
গ্রাম	আনুষ্ঠানিক	৭৫.৬	২৪.৪
	আধা-আনুষ্ঠানিক	৭০.৭	২৯.৩
	অনানুষ্ঠানিক	৬৩.৬	৩৬.৪
শহর	আনুষ্ঠানিক	৫৬.৬	৪৩.৪
	আধা-আনুষ্ঠানিক	২৪.৭	৭৫.৩
	অনানুষ্ঠানিক	৩৫.৩	৬৪.৭
	আনুষ্ঠানিক	৭৭.৩	২২.৭
দরিদ্র	আধা-আনুষ্ঠানিক	৬২.২	৩৭.৮
	অনানুষ্ঠানিক	১৮.১	৮১.৯
	আনুষ্ঠানিক	৭০.৬	২৯.৪
অদরিদ্র	আধা-আনুষ্ঠানিক	৬৩.৬	৩৬.৪
	অনানুষ্ঠানিক	২৯.৫	৭০.৫

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

৩.৩। আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রসারে গৃহীত নীতি পদক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত অংশকে আর্থিক সেবাভুক্ত করে আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের আর্থিক সেবার আওতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন আমানত ও ঋণ জাতীয় পণ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি নৈতিক প্রচারণামূলক উদ্যোগ গ্রহণ। এ সব ব্যবস্থার অনেকগুলোই বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য প্রকৃতই সৃজনশীল ব্যবস্থা।

দেশের কৃষি ঋণ নীতিতে প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে এবং এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর ভিত্তি করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সার্বজনীন কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ নীতিমালা যথাযথভাবে সমন্বয়সাধন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ নীতির লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের কাছে সহজ উপায়ে ও হয়রানিমুক্তভাবে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সরবরাহ করা এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় ঋণ সেবা প্রসারিত করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো মানসম্মত ব্যাংকিং সেবা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া ও তার প্রসার ঘটানো। ঋণ সেবা থেকে বঞ্চিতদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে একটা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির অধীনে কৃষকরা তাদের আইডেনটিটি কার্ড/জন্ম সনদ এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দেখিয়ে ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন এবং এজন্য কেওয়াইসি (Know Your Customer) ফরম পূরণ করতে হয় না। এক্ষেত্রে নেই ন্যূনতম স্থিতি রাখার বাধ্যবাধকতা, নেই কোনো অতিরিক্ত চার্জ বা ফি। এ কর্মসূচির আওতায়

ইতোমধ্যে ৯.৫ মিলিয়ন নতুন হিসাব খোলা হয়েছে। এসব হিসাব কৃষকদেরকে সরকারি উপকরণ ভর্তুকি বিতরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসাবের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কৃষকদের মধ্যে ৭.২২ মিলিয়ন টাকার ডিজেল ভর্তুকি সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। এসব হিসাব ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ, রেমিট্যান্স সংগ্রহ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি বা পল্লী ঋণ কর্মসূচিতে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে প্রতিটা ব্যাংককেই বছরের শুরুতে কৃষি খাতে বিতরণের জন্য তার মোট ঋণের একটা নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রাখতে হয় এবং প্রতিটি ব্যাংকেই পল্লী ঋণের জন্য রাখা তার লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের টার্গেট অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ব্যাংকগুলো কর্তৃক তদারক করতে হবে। যেসব ব্যাংকের পল্লী শাখা নেই সেগুলো এনজিও/এমএফআই এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত আরেকটা সৃজনশীল পদক্ষেপ হলো বর্গাচাষীদের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা রাখা। বর্গাদার হিসেবে চিহ্নিত কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা দেয়ার বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণের সাবলিল ও ক্রমবর্ধমান প্রবাহ নিশ্চিত করতে বেশ কিছু সংখ্যক পুন:অর্থায়ন স্কীম চলমান রয়েছে এবং এসব স্কীম বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেই পরিচালনা করে থাকে।

এ কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক ভূমিহীন বর্গাচাষীদের মধ্যে ঋণের ব্যবস্থা করার জন্য দেশের একটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (ব্র্যাক) অংশীদারিত্বে ৫ বিলিয়ন টাকার একটি পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ব্যাংক পর্যায়ে কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় প্রক্রিয়া মনিটর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১২-১৩ সালে মোট ১০২ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩.৭৫ মিলিয়ন বর্গাচাষীর কাছে ২০০৯-১০ সালে ৪.৭ বিলিয়ন টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ৪.২৭ মিলিয়ন বর্গাচাষীর কাছে ৭.৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। অন্যদিকে জুন ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাংক দেশের ৩৭টি জেলার ১৭১টি উপজেলায় ০.২৩৪ মিলিয়ন বর্গাচাষীর কাছে ২.৬৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে।

এসএমই খাত উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের তিনটি পুন:অর্থায়ন স্কীম রয়েছে এবং এ খাতে ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এসএমই কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিতকরণ ও কার্যকর মনিটরিং নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট নামে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। এসএমই খাতের জন্য ৬ বিলিয়ন টাকার একটি পুন:অর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়েছে এবং এ তহবিলের ১৫ শতাংশ অর্থ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ০.২৪ মিলিয়ন উদ্যোক্তাকে (০.২২ মিলিয়ন পুরুষ ও ০.০২ মিলিয়ন নারী উদ্যোক্তা) এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৯.৪১ বিলিয়ন টাকা। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের

ওপর জোর দিয়েছে। এ পর্যন্ত এসএমই ব্যবসায় জড়িত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ তিনটি পুন:অর্থায়ন স্কীমে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বিষয় পরিচালনার জন্য বিস্তারিত পরিচালনা পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে।

এসএমই সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং এসএমই, কৃষি ইত্যাদির মতো অগ্রাধিকার খাতে বর্ধিত পরিমাণে ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল সেন্টারকে এসএমই/কৃষি শাখা হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক শর্ত হলো এসব শাখার অর্ধেক আমানত এসএমই/কৃষি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং এসব শাখা অবশ্যই উপজেলা সদর ও বিভাগীয় শহরের বাইরে স্থাপিত হতে হবে যেখানে ব্যাংক সেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সহজ ও কার্যকর ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করেছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে তাদের প্রতিটি শাখার একজন ব্যাংক কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অবহিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি খাত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষতি সাধিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের শর্ত শিথিল করা (যেমন ঋণ পরিশোধের সময় সম্প্রসারণ), কৃষকদের নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কৃষকদেরকে সহজ উপায়ে ও অব্যাহতভাবে কৃষি ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন বছর মেয়াদি ঘূর্ণায়মান শস্য ঋণ সীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যবস্থাধীনে শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকরা পুন:ডকুমেন্টেশন ছাড়াই ঋণ সুবিধা ভোগ করে। অধিকন্তু ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব সহজ করা হয়েছে এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের কাছে ঋণ অনুমোদন বা মঞ্জুরের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে।

গ্রাহকদের বিভিন্ন অংশের জন্য উদ্ভাবনীমূলক ব্যয়সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা প্যাকেজ মোবাইল ফোন ও স্মার্ট কার্ড প্রযুক্তি প্লাটফর্ম এবং ব্যাংক/এমএফআই এর মধ্যে উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অধিকন্তু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক সেবার সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে ও ব্যাংকের সাথে সাধারণ মানুষের সংযোগ বাড়াতে, আমানত, ঋণদান, রেমিট্যান্স ও পেমেন্ট বা অর্থায়ন সেবা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত নেয়া, আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি ও অর্থ পাচার, অবৈধ হুন্ডি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রায়শ দেশব্যাপি রোড শোর আয়োজন করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট ব্যবস্থার অটোমেশন কম খরচে, সহজ উপায়ে ও দ্রুততার সাথে রেমিট্যান্স ও অর্থ প্রেরণ সেবার ব্যবস্থাকরণ এবং দেশে ও বিদেশে অবস্থিত কর্মরত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স প্রাপকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিস্তারিত ও গভীরতর করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করছে। এ ধরনের উদ্যোগের কারণে বেশ কিছু আইটিভিত্তিক রেমিট্যিান্স ডেলিভারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যেগুলো গতি ও ব্যবহারের দিক দিয়ে আগের ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর। বাংলাদেশে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ও অনলাইনে স্বয়ংক্রিয় চেক সেটেলমেন্ট চালু হয়েছে। ফলে গ্রাহকদের বিভিন্ন অংশের কাছে তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা মোতাবেক নতুন নতুন সার্ভিস প্যাকেজ প্রবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক সেবায় তাদের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

পল্লী এলাকায় কৃষি ও অকৃষিজ স্বনিয়োজন, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ ইত্যাদির জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে (পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে) ঋণ তহবিলের ব্যবস্থা করছে সরকার। বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে পল্লী এলাকার দরিদ্রদেরকে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে। দ্রুত রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে দেশের ডাক বিভাগও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। দেশের দুর্গম এলাকায় বসবাসরত জনগণের চাহিদা পূরণে ডাক সেবার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গম এলাকায় বেসরকারি খাত কর্তৃক সেবা প্রদান ব্যয়বহুল ও অলাভজনক বিবেচিত হয়ে থাকে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে প্রতিটি শাখার একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত করার জন্য দেশের সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে অগ্রাধিকার দিতে এবং আর্থিক সেবায় তাদের প্রবেশ নিশ্চিত করতে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের জন্য প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসরণ করতে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও কৃষি ব্যাংকগুলোকে ইতোমধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, অনানুষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণকারী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অতি সন্নিবেশ রয়েছে। গত কয়েক দশকে দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও এসএমই কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও দরিদ্র মানুষ ও গ্রাম এলাকায় আর্থিক সেবা প্রাপ্তি এখনও অনেক কম। আর্থিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষদের টার্গেট করে একটা ব্যাপকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলের অধীনে আরও অধিক কার্যকর নীতি-কৌশল গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি, যেমন বর্গাচাষী ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে ঋণ দেয়া, আর্থিক সেবায় জনগণের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিতে কেবল সহায়তা করছে তাই নয়, অধিকন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর, যা অত্যধিক শোষণমূলক বলে বিবেচিত, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নির্ভরতা কমাতেও সহায়তা করছে।

আর্থিক সেবায় জনগণের অধিকতর প্রবেশ নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটিবিচ্যুতিতে নিহিত আর্থিক বাজারের দুর্বলতাসমূহকে (যেমন ভালোভাবে ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, অদক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা) গৃহীত নীতিসমূহের মাধ্যমে প্রতিকার করতে হবে। দক্ষ, কার্যকর ও সুসংগঠিত আর্থিক খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তবে সেজন্য বাজার ব্যর্থতাকে পরিহার করতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্ধিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আবশ্যক আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি বাজার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করতে পারে বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের কাছে আর্থিক সেবার আওতা প্রসারিত করার মাধ্যমে।

ব্যয়সাশ্রয়ী ও সময়মতো আর্থিক সেবা প্রদানে প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যথোপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় আর্থিক সেবার প্রসার ও ঋণ প্রদান সংশ্লিষ্ট সমস্যার কার্যকর সমাধান করা যায়। দেশের সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত জনগণের কাছে পৌঁছুতে প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

গত দশকে দেশের আর্থিক খাতে দ্রুত অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক খাত এখনও আকারে ছোট ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। ব্যাংকিং খাতে তুলনামূলকভাবে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হলেও পুঁজি বাজার

এখনও বিকাশের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। আর্থিক খাতের ধীর উন্নয়ন ও এখাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের মূল কারণ নানাবিধ: আর্থিক খাতে প্রতিযোগিতার অভাব ও অন্যান্য কারণে অপর্যাপ্ত বাজার শৃঙ্খলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনাগত ও ব্যবস্থাপকীয় অদক্ষতা ও অকার্যকারিতা, বিধিবিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ধীরগতি ও তদারকির অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনাকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ এবং আর্থিক খাতের দুর্নীতি। ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির ফলে উচ্চ ঋণের ব্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি ঋণ খেলাপের দুষ্ট চক্র সৃষ্টি হচ্ছে। আর্থিক খাতে নৈতিকতার অভাব চলমান সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ যা দেশের অর্থনীতির সকল অংশেই লক্ষ করা যায়।

জনগণের সকল অংশের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেকোনো আর্থিক সেবায় জনগণের মোট অন্তর্ভুক্তি হার ৭৭ শতাংশ, যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক সেবার অংশ ৩৭ শতাংশ ও আধা-আনুষ্ঠানিক (এমএফআই ও সমবায় সমিতি) সেবার অংশ ৪৩ শতাংশ। আরেকটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আনুষ্ঠানিক ও আধা আনুষ্ঠানিক বাজারে যুগপৎ ঋণ গ্রহণের উপস্থিতি (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩
আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে যুগপৎ ঋণগ্রহণ

বাজার	শতকরা হার
শুধু আনুষ্ঠানিক বাজার	২০.১
শুধু আধা-আনুষ্ঠানিক বাজার	২৩.৮
শুধু অনানুষ্ঠানিক বাজার	৫.৬
আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক উভয় বাজার	৬.৭
আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় বাজার	৬.৯
আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় বাজার	৯.৪
সকল বাজার	৩.৪
কোনো আর্থিক সেবাপ্রাপ্তি নেই	২৩.২

উৎস: Khalily and Khaleque (2013)।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজার থেকে আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহ সেগুলো পুরোপুরিভাবে সমাধান করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে ঋণ বা সেবা প্রাপ্তি, সেবা লভ্যতা ও সেবা পাওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে প্রধান নির্দেশক যেগুলো আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে (যেমন ডিপোজিট, ঋণ, পেমেন্টস ও প্রযুক্তি) পরিদৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। আর্থিক খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করতে দুর্বল ব্যাংকিং কাঠামো, যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অভাব, পর্যাপ্ত আর্থিক শিক্ষার অভাব, ন্যূনতম স্থিতির বাধ্যবাধকতা, অপর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, স্বল্প আয়, ব্যাংক ও এমএফআইগুলোর উপযুক্ত সেবাপণ্য কাঠামোর সীমিত লভ্যতা, উচ্চ সেবাপণ্য ব্যয় এবং এমএফআই ঋণগ্রহীতাদের জন্য ক্রেডিট ব্যুরো ও বীমা সেবার অনুপস্থিতি ইত্যাদি হলো কতিপয় ক্ষেত্র যেখানে নতুন ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন।

দেশের সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত কৌশলসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাদের অনেকগুলোই ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। এগুলো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৌশলসহ

কঠোর ও সুদৃঢ় আর্থিক বিধিবিধান দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করা দরকার। এ কথা স্বীকার করা দরকার যে, একটা প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক খাত উন্নত আর্থিক সেবা প্রদান করার পাশাপাশি আর্থিক সেবা-পণ্যকে বৈচিত্র্যময়, বহুমুখী ও সম্প্রসারিত করবে।

৪। নীতি নিহিতার্থ ও উপসংহার

আর্থিক সেবা-সহায়তার প্রসার ও উন্নয়নের নিমিত্তে আর্থিক সেবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যারা এসব সেবা থেকে বঞ্চিত তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আর্থিক সেবা-সহায়তার আওতার বাইরে থাকার নানাবিধ কারণ রয়েছে। চাহিদাগত দিক থেকে সচেতনতার অভাব, স্বল্প আয় ও স্বল্প সম্পদ, সামাজিক বর্জন (exclusion), অশিক্ষা ইত্যাদি আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। সরবরাহগত দিক থেকে আর্থিক সেবা বহির্ভূত থাকার সাধারণ কারণগুলো হলো ব্যাংক শাখা থেকে খানার দূরত্ব, শাখার কর্ম-সময়, জটিল ডকুমেন্টেশন ও অন্যবিধ প্রক্রিয়া, গ্রাহক অনুপযোগী সেবা-পণ্য, স্টাফদের মনোবৃত্তি ইত্যাদি। এসবের ফল হলো উচ্চ লেনদেন খরচ ও লাভজনকতা কম হওয়া। পক্ষান্তরে ঋণের অন্যান্য উৎসের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও সহজলভ্যতা ও অনানুষ্ঠানিক বাজারের অন্যান্য বিদ্যমান সুবিধার কারণে অনানুষ্ঠানিক ঋণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে ও চালু রয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ভোগ-দখলী কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, স্বনিয়োজিত কর্মী ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী, শহুরে বস্তিবাসী ও ফুটপাথবাসী, অভিবাসী, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী, দরিদ্র খানাপ্রধান ও মহিলারা। শহরাঞ্চলে আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগণের বেশ কিছু এলাকা থাকা সত্ত্বেও গ্রামেই আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি।

ব্যাংক শাখার ব্যাপক বিস্তার এবং এমএফআই ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশের বয়স্ক মানুষের এক-চতুর্থাংশ অদ্যাবধি আর্থিক সেবা বহির্ভূত। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির বিবেচনায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অবস্থা এখনও খারাপ। যেমন জিডিপিতে গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের অবদানের তুলনায় ব্যাংক সেবায় তাদের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ২০১৩-১৪ সালে জিডিপিতে কৃষির অংশ ছিল প্রায় ১৬ শতাংশ, অথচ মোট আগামে (advance) কৃষিখাতের আগামের অংশ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। দেশের জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়, এক ব্যাপক অংশ আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকায় মূল ধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাপণ্যে তাদের প্রবেশ সীমিত। পল্লী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে নতুন শাখার খোলার ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটি নতুন শাখার বিপরীতে গ্রাম এলাকায় কমপক্ষে একটি নতুন শাখা খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১২ সালে দেশের মোট ব্যাংক শাখার ৫৭ শতাংশ গ্রাম এলাকায় অবস্থিত হলেও মোট আমানত ও এডভান্সে পল্লী এলাকার শাখাসমূহের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৭ ও ১২ শতাংশ, যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগণের স্বল্প অন্তর্ভুক্তিকেই নির্দেশ করে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রাম এলাকার দরিদ্র জনগণকে নতুন ও অধিকতর উৎপাদনশীল আয় উপার্জনের সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করতে, ব্যক্তিগত আর্থিক সংকট ও অপ্রত্যাশিত

ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম করতে এবং দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ বাড়াতে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ও সৃজনশীল প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের বয়স্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেরই ব্যাংক হিসাব নেই বা তারা অন্য কোনো আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা ব্যবহার করে না। কেবল দারিদ্র্যের কারণে নয় অধিকন্তু ব্যয়, খানা থেকে ব্যাংক শাখার দূরত্ব ও অন্যবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা আর্থিক সেবা-সহায়তার আওতা বহির্ভূত।

এক্ষেত্রে সরকারের কৌশল হওয়া উচিত সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সেবায় দরিদ্র পরিবারগুলোকে যুক্ত করতে মোবাইল যোগাযোগ ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে সাধিত উৎকর্ষকে কাজে লাগানো। আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগণের অন্তর্ভুক্তি তাদেরকে নতুন কৃষি প্রযুক্তি সফলভাবে গ্রহণে, নতুন ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগে এবং নতুন ও অধিকতর উৎপাদনশীল চাকুরি সন্ধানে সহায়তা করবে। একই সাথে জনগোষ্ঠীর এক বৃহদাংশকে স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আর্থিক বিপর্যয় ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত কারণে গভীর দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। সুতরাং দেশের দরিদ্র পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ গ্রহণে সাহায্য করতে অথবা কোনো সংকট বা জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সহায়তা করতে সঞ্চয়, পেমেন্ট, ঋণ, বীমা, বিশেষ করে সংকটময় মুহূর্তে, সেবার জন্য কার্যকর হাতিয়ার বা উপায়ের ব্যবস্থা করাকে দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা কার্যকর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, আমানত ও ঋণ হিসাবে সংখ্যা প্রতি হাজার মানুষে ২০০৫-২০১০ সময়কালে যথাক্রমে ২৪২ থেকে বেড়ে ৩৩৩ এবং ৫১ থেকে ৬৩ হয়েছে তবে একই সময়কালে গ্রাম এলাকার ক্ষেত্রে আমানত হিসাব প্রতি হাজার মানুষে ১২৭ থেকে বেড়ে ১৮৯ হয়েছে। অন্যদিকে ঋণ হিসাবের সংখ্যা ২০০৫ সালের ৫৩ থেকে কমে ২০১০ সালে ৫১ হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর, যাদের বেশিরভাই গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র মানুষ, এক উল্লেখযোগ্য অংশ আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা পায় না। ফলে বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবার নগদ অর্থ ও ভৌত সম্পদ (স্বর্ণালংকার ও পশুসম্পদ) ব্যবহার করে নগদ (cash) অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে বা তাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাতে অনানুষ্ঠানিক বাজারের ঋণদাতা বা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব অনানুষ্ঠানিক লেনদেন অনিরাপদ, ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে থাকে এবং পরিবারের কোনো সদস্যের মারাত্মক রোগব্যাধির ক্ষেত্রে সামান্য সহায়তা প্রদান করে।

সুযোগসমূহ

আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রাম ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গত কয়েক বছরে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, মোবাইল নিবিড়তা বিস্তার ও মোবাইল আর্থিক সেবা প্রবর্তন সকল এলাকার ব্যাংক সেবা থেকে বঞ্চিত জনগণের কাছে এই সেবা প্রদানের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।[১১] বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখা

[১১]মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছি। এ সংজ্ঞানুযায়ী এমএফএস বলতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একগুচ্ছ আর্থিক সেবা প্রদান বোঝায়। এমএফএস এর তিনটি প্রধান ধরন হলো মোবাইল মানি ট্রান্সফার,

গেছে, এসব ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ দেশের সকল মানুষের কাছে এখনও পৌঁছুয়নি এবং শিক্ষা, আয়, নগরায়ন ও জেন্ডার ইত্যাদি কারণে পার্থক্য এখনো রয়ে গেছে।[১২] গত কয়েক বছরের তথ্য থেকে দেখা যায়, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মোবাইলের ব্যবহার দেশের পুরুষ জনগোষ্ঠী, শহর এলাকায় এবং তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মোবাইল ফোন দরিদ্র নারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয় কারণ শিক্ষার অভাব ও অক্ষর জ্ঞানহীন হওয়ায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের মোবাইল ফোন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সামর্থ্য খুবই সীমিত। মোবাইল আর্থিক সেবা দরিদ্র মহিলাদের জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে যে ধরনের জ্ঞান ও ধারণা এবং পরিচয় থাকা দরকার তা তাদের থাকে না।[১৩]

দেখা গেছে, উন্নত আর্থিক হাতিয়ারে দরিদ্র জনগণের প্রবেশ বাড়ালে উচ্চ আর্থিক উপকারিতা লাভে সহায়তাকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কার্যকর আর্থিক সেবার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের সেবা করা ব্যয়বহুল কারণ তাদের বেশিরভাগ লেনদেন নগদ টাকায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ইউটিলিটি কোম্পানি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য সুরক্ষা, স্থানান্তর ও অগ্রগমন করা ব্যয়বহুল এবং তারা এসব খরচ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে উন্নত ও প্রাগ্রসর দেশগুলিতে জনগণ তাদের বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন ডিজিটাল উপায়ে সম্পন্ন করে। বাংলাদেশে এরূপ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ ও পরিধি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে যেহেতু মোবাইল যোগাযোগে সংঘটিত বিপ্লব ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের দ্রুত অগ্রগতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক হাতিয়ার, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে, এর সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগণের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রসারিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। ব্যয় সাশ্রয় করা ছাড়াও ডিজিটাল আর্থিক সেবার নানাবিধ সুবিধা রয়েছে, যেমন (১) এগুলো আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাত ও অর্থনীতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সাথে দরিদ্র জনগণকে যুক্ত করে; (২) আর্থিক প্রবাহকে সঠিকভাবে নজরদারি করা যায় ডিজিটাল উপায়ে যা নিরাপদ ও দ্রুততর লেনদেন সক্ষম করে এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও চুরির সুযোগ নেই বা এজন্য কোনো সন্দেহ থাকে না; (৩) ঋণ ও অন্যান্য ট্রান্সফার সরাসরি ব্যাংকে ডিপোজিট করা সেবাগ্রহণকারীকে দ্রুততর করতে সাহায্য করার পাশাপাশি পরিবারে নারীদের অধিকতর আর্থিক কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং এভাবে তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে; (৪) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের চাহিদা উপযোগী সেবাপণ্য উন্নয়নে দরিদ্র গ্রাহকদের আর্থিক ইতিহাস ব্যবহার করতে পারে; এবং (৫) তথ্য ভাগাভাগি (sharing), যেমন রিমাইন্ডার প্রেরণ, করা যায়।

সরকারকে আর্থিক সেবায় দরিদ্রদের প্রবেশ বা অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উদ্ভাবনীমূলক উপায়ের প্রসার এবং এসব উপায়ের মাধ্যমে সেবা প্রদানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণের উপর জোর দিতে

মোবাইল পেমেন্টস এবং মোবাইল ব্যাংকিং (দেখুন http://blogs.worldbank.org/psd/e-money-mobile-money-mobile-banking-what-s-the-difference).

[১২]জিএসএম এসোসিয়েশন, মোবাইল অপারেটর ও সম্পর্কিত সংগঠনসমূহের একটি বৈশ্বিক সংস্থা, এর মতে পুরুষদের চেয়ে নারীরা কম মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য ব্যাপক ও উর্ধ্বমুখী, যা ৩৭ শতাংশ (দেখুন *Women and Mobile: A Global Opportunity*, GSMA, 2012).

[১৩]দেখুন Unlocking the Potential: Women and Mobile Financial Services in Emerging Markets, GMSA, 2013.

হবে। এসব উপায়ের জন্য যেহেতু প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়, যা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের চাহিদা উপযোগী হতে হয়, সেহেতু সরকারের নীতি কৌশলকে সহায়তা দেয়া উচিত সেবাপণ্য ডিজাইনে আবশ্যকীয় অন্যান্য দিককে সুনির্দিষ্ট করতে, যার ফলে দরিদ্র জনগণ ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণ ও ব্যবহারে উৎসাহিত হবে। সরকারকে এসব উন্নয়নে সহায়ক নীতি ও বিধিবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোকে সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা ও তার ধরন সম্পর্কিত তথ্যের অভাব। যদিও বিভিন্ন কৃষক গ্রুপের চাহিদা/প্রয়োজন অনুধাবনে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সহ অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে খুব সামান্য জানা যায়। দরিদ্র জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য এসব কৃষকের জীবন-জীবিকার, কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী ও আয়ের অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক উৎসে অংশগ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আয়ের উৎসসমূহকে বিভিন্নমুখী করার সুযোগ নির্ধারণ করতে (দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে) কিভাবে দরিদ্র কৃষকরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, তাদের মনোভঙ্গি ও আচরণ অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক সেবা প্রদানকারীদেরও একটা সক্রিয় আগ্রহ থাকা উচিত এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানে, তারা কিভাবে তথ্য পায়, এবং তথ্য পেতে কিভাবে প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তারা কিভাবে আর্থিক সেবার উৎপাদনশীল ব্যবহারকারীতে পরিণত হয় প্রভৃতি তথ্য জানার।

বাংলাদেশে আর্থিক সেবা বিভিন্ন আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর, যারা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার অংশ, মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশে তিন ধরনের আর্থিক সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে- আনুষ্ঠানিক, আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। এ তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যটা হয়ে থাকে আইনি কাঠামো, যা ঋণদাতাকে সহায়তা প্রদান করে ও আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। সারণি ১৪ সম্ভাব্য গ্রাহকদের ব্যবহারকারী ও অব্যবহারকারী হিসেবে বিভাজন করা হয়েছে এবং তিনটি জোনেও ভাগ করা হয়েছে। যদিও সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা প্রদান করে এবং ব্যাংকিং তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং বিধিবিধান মেনে চলে, আধা-আনুষ্ঠানিক সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। এসব প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে লাইসেন্স পেয়ে থাকে এবং তাদের তদারকি ও নজরদারিতে থাকে। পক্ষান্তরে অনানুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা ব্যক্তি ও সরকারি বিধিবিধান ও তদারকির বাইরে থেকে ঋণসেবা প্রদান করে।

ডিজিটাল আর্থিক সেবা

ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ প্রদান (পেমেন্ট) ব্যবস্থা যেহেতু ইতোমধ্যে পল্লী এলাকায় শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে সেহেতু সরকারকে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও অন্যান্য আর্থিক সেবাদাতাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে আর্থিক সেবার পরিসর বাড়াতে যাতে দরিদ্র জনগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও মহিলারা, ডিজিটাল উপায়ে আর্থিক সেবা পেতে পারে। যেহেতু দেশের পল্লী এলাকায় যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে সেহেতু ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম পল্লী সমাজের নাগালে প্রসারিত করতে প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং এসব সিস্টেম ব্যবহারে দরিদ্র জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পেমেন্ট সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এগুলো পেমেন্ট সংগ্রহ, দ্রব্যাদি ক্রয়, পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিসেবার বিল প্রদান, এবং পরিবার ও ব্যবসার অংশীদারদের

কাছে অর্থ প্রেরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণকে সক্ষম করে। এছাড়া এগুলো সরকারকে কর সংগ্রহ ও সামাজিক পেমেন্টস বণ্টনে সক্ষম করে।

এ কথা সত্য যে, নতুন ও বিদ্যমান ব্যবসাকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও প্রসারে অর্থায়ন সেবা প্রাপ্তি প্রয়োজনীয়। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, প্রতিযোগিতাকে তীব্রকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। আর্থিক সেবার সঠিক টার্গেটিং করা গেলে আয় স্তরের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা জনগণের আয় বাড়বে এবং এভাবে আয় অসমতা ও দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। আর্থিক সেবা প্রাপ্তির অনুপস্থিতি ব্যক্তি বা উদ্যোগের সেবা ও ঋণের ব্যাপ্তি সীমিত করে দেয়। দরিদ্র ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে শিক্ষা ও ব্যবসায় বিনিয়োগে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বা অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয় যা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়ার মাধ্যমে অসমতা চক্র ও নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণ হয়। অধিকন্তু ব্যক্তিদেরকে স্বনির্ভর হতে হলে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদনশীল ও টেকসই হতে হলে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ব্যাপকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও মৌলিক সেবা প্রসারে ডিজিটাল অর্থায়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ১১৫ মিলিয়ন লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। এজন্য আর্থিক সেবাকে অন্যান্য খাতেও (যেমন কৃষি, পরিবহন, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জ্বালানি) বিস্তৃত করার একটা শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে ডিজিটাল অর্থায়ন। বস্তুত দরিদ্রদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যেসব বড় বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো দূর করতে ডিজিটাল সমাধান ও নতুন প্রযুক্তির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে যা ২০২১ সাল নাগাদ আর্থিক সেবায় সার্বজনীন অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।[১৪]

ডিজিটাল অর্থায়ন প্রথাগত আর্থিক সেবার সুবিধাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এটি বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের একটা শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।[১৫] ডিজিটাল অর্থায়নের বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি ও অন্যান্য উন্নয়ন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে বিকাশ (Bkash) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনকে আরও প্রসারিত করতে হবে। পরিকল্পনার মেয়াদকালে ঋণ, বীমা, সঞ্চয় ও আর্থিক শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ ধরনের আর্থিক সেবা ব্যবহারে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদানে সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগণ অর্থ প্রেরণ সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ, বীমা ও অন্যান্য সেবার আওতায় আসবে বেশি করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রসারে ডিজিটাল অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি তাদেরকে আর্থিক সেবা/অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সুযোগ দেয়া সহ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম, নিরাপদ আর্থিক সেবাপণ্য প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া আর্থিক ইতিহাস (financial history) তৈরির সুযোগও দিবে। ডিজিটাল অর্থায়নের সম্ভাবনা প্রচুর ও ব্যাপক বিশেষ করে পল্লী এলাকার উন্নয়নে। উদাহরণস্বরূপ

---

[১৪]যাহোক বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থায় সাধিত উন্নয়ন সকল জনগণের কাছে পৌঁছুয়নি এবং শিক্ষা, আয়, নগরায়ন ও জেন্ডার ইত্যাদি কারণে গ্যাপ এখনো রয়ে গেছে।

[১৫]এটা যোগ করা যেতে পারে যে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক সেবাপ্রদানকারী বিকাশ লিমিটেড ২০১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রা শুরু করে; ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এর রেজিস্ট্রিকৃত গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২ মিলিয়ন এবং ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ তা বেড়ে ১১ মিলিয়নে দাঁড়ায়। বিকাশ কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর নয় এবং এর কোনো স্থায়ী গ্রাহক ভিত্তি নেই যাদের জন্য মোবাইল আর্থিক সেবা যুক্ত করতে পারে। বিকাশ নিজেই প্রতিটা ক্লায়েন্ট জোগাড় করে নেয়। বিকাশের দ্রুত অগ্রযাত্রার মুলে তিনটি কারণ একসাথে কাজ করেছে: মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ গ্রুপের অংশীদারিত্বভিত্তিক ভিশন এবং নমনীয় ও সহায়ক নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে সরকারের পরিকল্পনা হওয়া উচিত পোস্ট অফিসকে ব্যবহার করা, যাদের বেশিরভাগই গ্রাম এলাকায় অবস্থিত। এসব পোস্ট অফিস বিবিধ ধরনের আর্থিক সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে- ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স ও রেমিট্যান্স ইত্যাদি সেবা প্রদানে, এমনকি দেশের সবচেয়ে দুর্গম এলাকায়ও। সরকারকে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে যা খরচ, দূরত্ব, বিধিবিধানমূলক জটিলতা ইত্যাদি বাধা দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হবে।

কার্যকর আর্থিক সেবা ও সেবাপণ্যের ব্যবস্থা করা

আর্থিক সেবার উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারকে অধিকতর সৃজনশীল জ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে: দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য যেসব সেবাপণ্য রয়েছে সে সম্পর্কে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব পণ্য যোগান দেয় তাদের সম্পর্কে, সফল ও উদ্ভাবনীমূলক মডেল গ্রহণের তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তবতা বোঝা, সৃষ্টিশীল ধারণাগুলোর সফলতা কোন উপাদানগুলো নিশ্চিত করে এবং কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর বাইরে থেকে কেন অনেকে এগুলোকে গ্রহণ করে তা জানা। এর অন্তর্ভুক্ত হবে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য পণ্য উন্নয়ন ও পরীক্ষা করা। প্রযুক্তি কিভাবে খরচ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানকারী কার্যকর উপায়ে এসব দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারে তা চিহ্নিত করার জন্য উপায় বের করতে মোবাইল নেটওয়ার্ক এর অপারেটরদের ও অপরাপর বেসরকারি খাতের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সরকারকে প্রাসঙ্গিক সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করা উচিত।[১৬]

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ডিজিটাল আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে কিছু তথ্য-প্রমাণ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ডিজিটাল সেবা গুরুত্বপূর্ণ: (১) ক্ষুদ্র কৃষকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জটিল পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করা যেমন কৃষকদের পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে খরচ ও ঝুঁকি এবং ভর্তুকিকৃত ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে, (২) এসব জটিলতা দূর করতে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ব্যবহারের সম্ভাবনা যাচাই, এবং (৩) প্রাথমিক বাধা ও সফলতাসমূহকে তুলে ধরা। ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ডিজিটাল আর্থিক সেবার দ্রুত বিকাশের প্রেক্ষিতে এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে যেখানে মোবাইল চ্যানেলের মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রা উন্নয়নে বা উন্নতির জন্য বড় ধরনের সম্ভাবনা যোগাচ্ছে

[১৬]মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে সাধারণ অথচ শক্তিশালী উদ্ভাবন ব্যবহার করলে কৃষকদের সহজে এক জায়গায় একত্রিত করার মাধ্যমে ঋণ লেনদেন খরচ এমনভাবে কমবে যা আর্থিক সেবা পণ্যের কার্যকর ব্যবহারের পথ খুলে দিবে যেগুলো আগে অলাভজনক মনে করা হতো। এটি সঞ্চয় জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে যা আবার ব্যবহারকারীদের পরিবারের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যত খরচের চাহিদার নিরিখে বাস্তবসম্মত উপায়ে সঞ্চয় করতে সহায়তা করবে। আর্থিক সেবাপ্রদানকারীরা এখন অনেক ভালো করে জানে কিভাবে দরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ ম্যানেজ করতে হয় এবং কিভাবে নিয়মিত রিপেমেন্টস পেতে হয়। বেসরকারি খাতের কৃষি সেবাপণ্যেও ব্যবসায়ীরা আর্থিক সেবায় তাদের ভূমিকা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করছে এবং কাঁচামালের স্থিতিশীল সরবরাহ ও শস্য উৎপাদনের লাভজনকতা নিশ্চিত করতে অন্যান্য দ্রব্য ও সেবার (যেমন বীজ, উৎপাদন উপকরণ, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, বীমা ইত্যাদি) সাথে ঋণ সেবাকে সম্পৃক্ত করছে। কৃষকদের পরিবারের সাধারণ ও দৈনন্দিন এবং কৃষি ও অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজন সহ গ্রামীণ পরিবারগুলোর বহুবিধ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক আর্থিক সেবার আরও উন্নয়ন ও বিস্তারণ একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং একই সাথে সুযোগ হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে স্মার্ট ফোন, টেবলেট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে সহজে বহনযোগ্য কম্পিউটিং সুবিধা দিলেও পল্লী কৃষক সমাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পদকে তেমন একটা কাজে লাগাতে পারছে না। এখানে একটা বড় সুযোগ রয়েছে খামার পর্যায়ে দক্ষতা এবং কৃষক ও অন্যান্য গ্রামীণ উৎপাদকদের সক্ষমতা বাড়ানোর যাতে তারা তাদের পেশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উত্তমভাবে ব্যবহার ও ভাগাভাগি করতে পারে। এরূপ প্রযুক্তির গ্রহণ ও ব্যবহার দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য আর্থিক সেবা ও উন্নয়ন বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক হবে। সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে দেশের সকল মানুষের সঞ্চয়, পেমেন্টস, ঋণ, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশ থাকা উচিত। ব্যাপক পরিসরের আর্থিক সেবার লভ্যতা নিশ্চিত করা গেলে সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয়েই উপকৃত হবে। সঠিক পরিসরের সেবা পণ্য নিয়ে জনগণের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে সাড়াদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে যা সেবা প্রদানকারীরা সেবাগ্রহীতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীরতর করতে, বাজারের বিস্তৃতি ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল উপায়ে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং তাদের নিজস্ব ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করবে। সেবা পণ্য উন্নয়নে উদ্ভাবনকে সঠিক পথে চালিত করতে প্রাসঙ্গিক কৌশলসমূহকে তিনটি প্রধান শর্ত প্রতিপালন করতে হবে: (১) প্রণোদনা: গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা; (২) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: সেবাপণ্য উন্নয়নের প্রয়োজন বিষয়ে দরিদ্র গ্রুপগুলোর কাছ থেকে আন্তক্রিয়া ও শিক্ষা নিতে সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগানো; এবং (৩) নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ: নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশে আবশ্যক পরিবর্তন আনা যাতে এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন সেবাপণ্য ও সেবাপ্রদানের পদ্ধতি উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।

সেখানে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। একটি প্রধান বাধা হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে মোবাইল ফোনের পরিব্যাপ্তি সীমিত যা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণের প্রয়োজনকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু মোবাইল চ্যানেলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে ডিজিটাল আর্থিক সেবা নির্ভর করে মোবাইল ফোন ব্যবহার ও মোবাইল অর্থ সেবার বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার উপর। এটা নির্দেশ করে যে মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক সেবার সফলতা নির্ভর করবে বহুলাংশে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের মাত্রা, কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণে মোবাইল ফোন ব্যবহারে ক্ষুদ্র কৃষকদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর। অধিকন্তু ডিজিটাল আর্থিক সেবার বিদ্যমান উদ্ভাবনসমূহকে অন্যান্য উদ্ভাবনের, যেগুলো আর্থিক প্রয়োজন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি পরিবারগুলোর আচরণ ও প্রত্যাশার উপর ভিত্তিশীল, এর সাথে পরিপূরক করা।

অধিকন্তু অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যস্বত্বভোগী ও অন্যান্য এজেন্টের, যারা উপকরণ ক্রয়ে ও অন্যান্য খরচ মিটাতে ঋণ দেয় এ শর্তে যে ফসল তোলার পর তাদের শস্য তাদের কাছেই বিক্রয় করতে হবে, সাথে সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষুদ্র কৃষক আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত সেহেতু তারা সাধারণত নগদ অর্থে সেবা মূল্য পরিশোধ করে। কৃষক ও এজেন্ট উভয়ের জন্য এ ব্যবস্থার অনেক দুর্বলতা রয়েছে। কৃষকদের জন্য নগদ অর্থ বিতরণে নিরাপত্তাজনিত এবং তরল অর্থের প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। উৎপাদন উপকরণ ও অন্যান্য কৃষিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থায়নকে ডিজিটালাইজড করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও লাখ লাখ ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছে যাদের সাধারণ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির উন্নয়ন দরকার, বিশেষ করে কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্য আর্থিক সেবা।

পল্লী পরিবারগুলোর বিভিন্ন গ্রুপের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাদি এবং আর্থিক সেবার চাহিদাকে এখনো ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়নি এবং কৃষি কর্মকাণ্ডের পরিচালনার অন্তর্নিহিত ঝুঁকির কারণে এসব গ্রুপের কাছে ঋণ সেবা প্রসারিত করার ঝুঁকি বেশি বলে ধারণা করা হয়। তাদের লেনদেনের আকার ছোট হওয়ায় সঞ্চয়, রেমিট্যান্স, অর্থ প্রেরণ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্র বীমা সেবা পণ্য প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আর্থিক সেবাভুক্তি বাড়ানোর উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মোবাইল ফোনের ব্যবহার কৃষকদের সহজে একজায়গায় একত্রিত করার মাধ্যমে তাদের লেনদেন খরচ কমাচ্ছে যা আর্থিক সেবাপণ্যকে লাভজনক করার পথ সৃষ্টি করছে যেগুলোকে আগে অ-অর্থনৈতিক ও অস্থায়ী মনে করা হতো। একইভাবে সঞ্চয় সেবাপণ্য ব্যহারকারীদের সঞ্চয় পুঞ্জিভূত করতে সহায়ক। আর্থিক সেবা প্রদানকারীরা অনেক বিষয়েই তাদের জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যেমন-কিভাবে দরিদ্র পরিবারগুলোতে ক্ষুদ্র ঋণ ম্যানেজ করতে হয় এবং কিভাবে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়। সেবার বর্ধিত কার্যকারিতা ও লাভজনকতার কারণে বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ দরিদ্রদেরকে আর্থিক সেবা প্রদানে তাদের ভূমিকা ক্রমাগত প্রসারিত করছে এবং টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করতে অন্যান্য দ্রব্য ও সেবার সাথে (যেমন বীজ, উৎপাদন উপকরণ, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, বীমা ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করছে।

এটা স্বীকার্য যে, দরিদ্র পল্লী পরিবারগুলোর বহুবিধ উদ্দেশ্যসাধনে কার্যকর সহায়তা প্রদানকারী আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ জটিল ধরনের। এরপ জটিলতার বিবেচনায় কৃষি ও অকৃষিজ উভয় ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক সেবার চাহিদাকে একটা

আংশিক ফ্রেমওয়ার্কে অনুধাবন করা উপকারী হতে পারে। বর্তমানে স্মার্ট ফোন ও অন্যান্য ডিভাইস ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকারী তথ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করে যেগুলো দরিদ্র ও পল্লী এলাকার কৃষক সমাজ কর্তৃক এখনো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে উঠেনি। এটা সম্ভব হলে এসব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি খামার পর্যায়ের দক্ষতা বাড়াতে ও তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য জরুরি তথ্য উত্তমভাবে ব্যবহার দরিদ্র কৃষকদের জন্য সক্ষম করে তুলবে। এছাড়া এরূপ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কাছে আর্থিক সেবা প্রদানে সহায়তা করবে।

বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য আর্থিক সেবা ও উন্নয়ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে পারলে তা বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক হবে। সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশের সকল মানুষের সঞ্চয়, পেমেন্টস, ঋণ, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশ থাকা উচিত। ব্যাপক পরিসরের আর্থিক সেবার লভ্যতা নিশ্চিত করা গেলে সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয়েই উপকৃত হবে। সঠিক পরিসরের সেবা পণ্য নিয়ে জনগণের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে সাড়াদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী এবং সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতর হবে। এছাড়া বাজারের বিস্তৃতি ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল উপায়ে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং তাদের নিজস্ব ঝুঁকি কমাতেও সক্ষম হবে।

বিচিত্র ধরনের সেবাপণ্যের চাহিদা বা প্রয়োজন নতুন কিছু নয় এবং বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে একগুচ্ছ সেবা প্রদানের উপায় বের করার চেষ্টা করছে যা সেবাগ্রহণকারীদের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হবে। যদিও সরকারকে এসব প্রচেষ্টা উৎসাহিত করা উচিত তা সত্ত্বেও স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে বিভিন্ন ধরনের সেবাপণ্য প্রদানের নতুন উপায় উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সেবা পণ্য উন্নয়নে উদ্ভাবনকে সঠিক পথে চালিত করতে প্রাসঙ্গিক কৌশলসমূকে তিনটি প্রধান শর্ত প্রতিপালন করা দরকার: (১) প্রণোদনা: গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা; (২) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: সেবাপণ্য উন্নয়নের প্রয়োজন বিষয়ে দরিদ্র গ্রুপগুলোর কাছ থেকে আন্তক্রিয়া ও শিক্ষা নিতে সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগানো; এবং (৩) নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ: নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশে আবশ্যক পরিবর্তন আনা যাতে এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন সেবাপণ্য ও সেবাপ্রদানের পদ্ধতি উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দেশের সকল এলাকায় ও গ্রামে, যেখানে ন্যূনতম সংখ্যক জনসংখ্যা আছে, ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য পরামর্শ দিতে পারে। এটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনএফএ হিসাব খোলায় সহায়তা করবে, যা প্রাথমিক সঞ্চয় হিসাব হিসেবে কাজ করবে, এবং এজন্য ন্যূনতম স্থিতির প্রয়োজন হবে না। এছাড়া ব্যাংকিং করেসপনডেনট মডেল ব্যাপকভাবে গ্রহণে সহায়তা করার পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং এর উন্নয়নে সহায়তা করবে যেহেতু ব্যাংকগুলো দেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক সেবা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে।[১৭] এসব প্রচেষ্টা সহায়ক নীতির দ্বারা পরিপূরক হবে এরূপভাবে যে এসব হিসাব অপ্রচলিত (Inactive) হবে না।

[১৭]আরবিআই-এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নীতির অংশ হিসেবে ভারতে ২০০০ মানুষ বাস করে এমন প্রায় সকল গ্রামে ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন পদ্ধতি

ক্ষুদ্র অর্থায়ন দরিদ্রদেরকে ছোট আকারের ঋণ ও অন্যান্য মৌলিক আর্থিক সেবা প্রদান করে এ বিবেচনা থেকে যে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এসব সেবার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে, যা ক্ষুদ্রঋণের মাতৃভূমি ও এর উদ্ভাবক হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত, ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য নিরসনকে টেকসই করার পাশাপাশি দরিদ্রদের সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ, আয় বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমানোর একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সফল ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সরকারি সংস্থা ও এনজিওসহ, যারা ঋণ, সঞ্চয় ও অন্যান্য সেবা প্রদানের উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি বের করেছে। ক্ষুদ্রঋণ মূলত এনজিওদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে দেশের কিছু সরকারি সংস্থা ও আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র অর্থায়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে। অধিকন্তু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি দরিদ্রদেরকে ঋণ প্রদানের খরচ কমানোর পাশাপাশি ঋণ প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও কমানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

দেশের ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মহিলা। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো খানার মহিলা প্রধান, স্বনিয়োজিত ব্যক্তিগণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ, পেনশনভোগী, বাস্তুহারা মানুষ, ক্ষুদ্র/প্রান্তিক কৃষক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতরা। এদের সবাই সাধারণত প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে এবং আর্থিক সেবার জন্য অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের উন্নয়নে, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশেষ করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান স্তরে, সরকারের সহায়তা করা উচিত। এটা দরিদ্রদের সেবাদানকারী অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। এ প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করবে যা প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত নেয় না। এছাড়া এসব প্রচেষ্টা দুর্গম এলাকার বসবাসরত দরিদ্রদের কাছে আর্থিক সেবার সরবরাহ প্রসারিত করবে। এসব প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হলো সার্ভিস ডেলিভারী ও পেমেন্ট ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের পদ্ধতি ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিবেশের (সুষ্ঠু আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোসহ) উন্নতি সাধন।

উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষসমূহকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ/আহরণ এবং ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা, বিশেষ করে দরিদ্র ও সেবাবঞ্চিত অঞ্চল বা খানাগুলোকে, প্রদানের উত্তম পদ্ধতিসমূহ ডকুমেন্ট করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর্থিক ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এরূপ তথ্যের প্রকাশ বা বিনিময় তথ্য অবমুক্তিকরণের এ প্রচেষ্টায় শামিল হতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহিত করবে।

আর্থিক শিক্ষা

দেশে আর্থিক সেবা-সহায়তায় প্রবেশের ব্যাপ্তি তুলনামূলকভাবে উচ্চ হলেও সব খানার, বিশেষ করে দরিদ্রদের, কাছে আর্থিক সেবা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও জ্ঞান নেই। অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব সেবার লভ্যতা বা এসব সেবা কিভাবে পেতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞাত নয়। উদাহরণস্বরূপ বীমা সেবার

ক্ষেত্রে শিক্ষার স্তর খুবই কম। বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের, যেমন বিজ্ঞাপন ও প্রচারণামূলক, মাধ্যমে আর্থিক সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব

ব্যাংক সেবা বহির্ভূত এলাকা এবং ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত পরিবারগুলোর কাছে আর্থিক সেবা প্রসারে দেশের আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশি সুবিধা থাকায় তারা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যেখানে অধিকতর সম্পদ রয়েছে সেখানে আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রয়েছে উচ্চতর স্তরের সক্ষমতা ও দক্ষতা। আনুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং আর্থিক সেবা বঞ্চিত এলাকা, পরিবার ও উদ্যোগগুলোর কাছে পৌঁছানোর একটা কার্যকর উপায় তৈরি করতে পারে।

ঋণের লেনদেন খরচ

অর্থায়ন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লেনদেন খরচ একটি অন্যতম প্রধান নির্ধারক। অর্থায়ন সেবায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপ্তি এবং ঋণের আকার নির্ধারণে লেনদেন খরচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে লেনদেন খরচ কমানো যেতে পারে কতিপয় সরবরাহগত পদক্ষেপ যেমন ব্যাংক শাখার গভীরতা বাড়ানো, ঋণ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির (ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সময় কমিয়ে ও উত্তম ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিয়ে) উদ্ভাবনের মাধ্যমে শাখাগুলোর দক্ষতার উন্নতি সাধন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি অন্যদিকে ঋণগ্রহণকারীদের লেনদেন খরচ কমবে।

এমএফআই ও অনানুষ্ঠানিক বাজার থেকে শিক্ষণীয়

ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ও অনানুষ্ঠানিক বাজারের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জামানত ও তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি ছাড়াই অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে ঋণ সেবা পৌঁছানো যেতে পারে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো যথাযথ প্রণোদনামূলক কাঠামোর উপস্থিতি সহ নিবিড় তদারকি ও নজরদারিতে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখা গেছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতেও ঋণ সেবা পণ্যকে বহুমুখী করা যেতে পারে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিশেষ করে ব্যাংক) এসব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে তাদের কর্মকাণ্ডকে সেভাবে উপযোগী করে নিতে। ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি এর কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করেও (প্রাসঙ্গিক তথ্যের দ্রুত সৃজন ও বিস্তারণে সহায়তা করতে) ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যেতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজার উন্নয়ন

দেশের ব্যাংকগুলো যেন অতি দক্ষতার সাথে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে সেজন্য যথাযথ প্রণোদনা ও গভর্নেন্স ব্যবস্থাবিশিষ্ট একটি প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বাস্তবে বেসরকারি খাতের চেয়ে সরকারি খাতের ব্যাংকে ঋণের সুদ বহির্ভূত খরচ বেশি হয়ে থাকে। এ ছাড়া সরকারি খাতের ব্যাংকসমূহে বিশেষ করে দেশের দুটি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (বিকেবি ও রাকাব) ক্ষেত্রে নৈতিক অধ:পতন একটি বড় বিষয়। এ সমস্যা

সমাধানে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে কঠোর ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি একটা সহায়ক/অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঋণগ্রহীতারা কম খরচে সেবা পেতে পারে এবং আমানত বা সঞ্চয়কারীরা ন্যায্য রিটার্ণ পায়।

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে আর্থিক সেবায় জনগণের অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ১০ টাকার প্রায় ৯ লাখ নতুন হিসাব খোলা হয়েছে। এসব হিসাব সরকারকে ভর্তুকি ও অন্যান্য সেবার অর্থ সরাসরি হিসাবধারীদের প্রদান করতে সহায়তা করছে। এসব হিসাব পরিচালনা হিসাবধারীদেরকে অন্যান্য আর্থিক সেবা ক্রয়ে উৎসাহ যোগানো ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক সেবার চাহিদা উজ্জীবিত করবে। মোট কথা, এই ধরনের হিসাব খোলা কৃষকদেরকে অধিকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করবে। তবে হিসাব খোলাই যথেষ্ট নয়, এই হিসাবকে সক্রিয় রাখাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

আর্থিক সেবায় দরিদ্রদের পর্যাপ্ত অন্তর্ভুক্তি অর্জনের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বা অন্তরায়সমূহ কার্যকরভাবে দূরীকরণে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

- আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে ইতোমধ্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত রেগুলেশনের অধীনে নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপে কদাচিৎ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগ প্রতিফলিত হয়। আর এসব পদক্ষেপের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাগত সমস্যার প্রতি সন্তোষজনকভাবে দৃষ্টি প্রদান করা হয়নি। এটা স্বীকার্য যে, আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহগত দুটো দিক রয়েছে এবং এ দুটো দিকের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।

- আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথাগত পদ্ধতি হচ্ছে জনগণই ব্যাংকের কাছে যায়, ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানসমূহ নয়। আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে প্রথাগত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

- আর্থিক সেবায় জনগণের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে নারী-বান্ধব আর্থিক সেবা ও সেবা পণ্যের উন্নয়ন সহ নারীদের প্রতি বর্তমানে যে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় তা আরও জোরালো করতে হবে।

- সেবা বহির্ভূত এলাকা ও জনগণের প্রতি লক্ষ রেখে আর্থিক বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ঋণ বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক আর্থিক সেবাপ্রদানকারীদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- বাধ্যতামূলক কৃষি/পল্লী অর্থায়ন কর্মসূচির অনুরূপ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক) প্রণয়ন করতে হবে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংককে এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রতিটা ব্যাংককে একটি জেলা বা এলাকা

নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যেখানে উক্ত ব্যাংকের দায়িত্ব হবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটানো। বাংলাদেশ ব্যাংক যৌক্তিক ও পরিমাপযোগ্য নির্দেশকের মাধ্যমে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্যক্রম মনিটর করবে।

- নির্ধারিত গতি ও ব্যাপ্তিতে আর্থিক সেবার প্রসার ঘটাতে বাংলাদেশ ব্যাংককে আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটা বিস্তারিত গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।

- দক্ষ ও স্থায়িত্বশীল আর্থিক সেবা প্রদানকারী হিসেবে পোস্টাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়, বাড়াতে নতুন কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে একটা শক্তিশালী বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতের সম্ভাবনাও প্রচুর। দেশে ৭০টির বেশি বীমা কোম্পানি থাকলেও তাদের কর্ম-প্রসার সীমা বা আউটরীচ সীমিত। দরিদ্র-বান্ধব সেবাপণ্য প্রবর্তন করা এবং এর কর্মপরিচালনা যথাযথভাবে মনিটর করার (বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে) মাধ্যমে বীমা খাতকে একটা গতিশীল খাতে পরিণত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

- দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় আর্থিক সেবার প্রসার ঘটাতে একাধিক নীতি-কৌশল উদ্যোগ যেমন চর ও হাওর এলাকার জন্য অধিকতর টেকসই সমাধান বের করা, সহজ উপায়ে ও ব্যয়-সাশ্রয়ী ভাবে এসব এলাকায় সেবা দিতে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, আনুষ্ঠানিক ও আধা-অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষায়িত আর্থিক সেবাপণ্যের উন্নয়ন ঘটানো (এমএফআইসমূহের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চর ও হাওর এবং অন্যান্য এলাকার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করতে) প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, জনগণের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা প্রদান কাজ বৃদ্ধি করতে বহুবিধ নীতি উদ্যোগ প্রয়োজন। এসব নীতি উদ্যোগ আর্থিক সেবায় দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের প্রবেশ বাড়াতে সহায়তা করবে এবং ঋণের অলভ্যতা সম্পর্কিত সমস্যা যেমন ঋণের ফাঁদে পড়া বা নিজের উৎপাদনশীল সম্পদ হারানো ইত্যাদি রোধ করবে। এ প্রেক্ষিতে দরিদ্র পরিবারগুলোকে অধিকতর ভালোভাবে সেবা প্রদানে ব্যক্তি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রয়োজনে খোলা ব্যাংক হিসাব (কম ফি, ন্যূনতম স্থিতির অনুপস্থিতি) দরিদ্রদের আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা ব্যবহারের প্রসার ঘটাবে। গ্রাম এলাকায় আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বর্তমানে এসব এলাকায় ব্যাংক শাখার সংখ্যার চেয়ে আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেবাপ্রদানকারীর সংখ্যা বেশি।

দরিদ্র পরিবারগুলোতে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার ব্যাপক ব্যবহার ও সঞ্চয় বাড়াতে সরকারি খাত অনেক কিছুই করতে পারে। সরকারি খাতের একটা প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগণের সেবা করার নিমিত্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করতে বেসরকারি খাতের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করা। এসব পরিবারের জন্য ব্যাপক আর্থিক শিক্ষা হচ্ছে একটা অগ্রাধিকার। সেবাপ্রদানকারীরা বর্তমানে অনেক দরিদ্র-বান্ধব আর্থিক সেবা দিচ্ছে। তবে দরিদ্র আর্থিক

সেবা গ্রহীতাদের জন্য উত্তম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সেবাপ্রদানকারীদের নজরদারিকরণে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা ও সঞ্চয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে পারে সরকারি খাত। এটাও স্বীকার্য যে, দেশের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো কর্তৃক আর্থিক সেবায় প্রবেশকে উৎসাহিত করতে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুগঠিত নয়। প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ চায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উন্নত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে দরিদ্র জনগণের আর্থিক সেবা-সহায়তা লাভের সুযোগ থাকবে, এজন্য প্রয়োজন হবে সমাজের অবশিষ্ট অংশের কাছে সহজলভ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাংকিং, ঋণ ও সঞ্চয় ইত্যাদি সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ্রন্থপঞ্জি

BB (2014): *Annual Report 2012-2013*, Bangladesh Bank, Dhaka.

BBS (2013): *Staristical Yearbook of Bangladesh*, BBS, Dhaka.

Beck, T. and A. Demirguc-Kunt (2004): "Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence," Policy Research Working Paper 3338, World Bank, Washington D.C

Beck, T., A. Demirguc-Kunt and M.S. Martinez Peria (2008): "Banking Services for Everyone? Barriers to Bank Access and Use around the World," *World Bank Economic Review, 22(3): 397-430.*

Beck, T., R. Livine and N. Loayza (2000): "Finance and the Sources of Growth," *Journal of Financial Economics*, 58:261-300.

Boucher, S. S., C. Guirkinger and C. Trivelli (2009): "Direct Elicitation of Credit Constraints: Conceptual and Practical Issues with an Application to Peruvian Agriculture," *Economic Development and Culttural Cange*, 57(4): 609-640.

Demerguc-Kunt, A., T. Beck and P. Honahan (2008): *Finance for All – Policies and Pitfalls in Expanding Access,* A World Bank Policy Report. Washington D.C.

Eswaran, M. and A. Kotwal (1990): "Implications of Credit Constraints for Risk Behaviour in Less Developed Economies," *Oxford Economic Papers,* 42: 473-482.

Eswaran, M. and A. Kotwal (1989): "Credit as Insurancer in Agrarian Economies," *Journal of Development Economics*, 31(1): 37-53.

Gonzalez-Vega, C. (1976): *Deepening Rural Financial Markets: Macroeconomic, Policy and Political Dimensions*, Broadening Access and Strengthening Input Market Systems Collaborative Research Support Programme (BASIS-CRSP) and the World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU), Ohio State University, Ohio.

IFC (2014): *Stories of Impact Small and Medium Enterprises: Key Driver for Growth and Jobs in South Asia,* International Finance Corporation, South Asia Office, New Delhi.

InM and CDF (2012): *Bangladesh Microfinance Statistics 2011,* Institute of Microfinance and Credit and Development Forum, Dhaka.

Islam, M. E. and M. S. A. Mamun (2011): "Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank," Working Paper Series WP 1101, Research Department, Bangladesh Bank, Dhaka.

Jaffee, D. and J. E. Stiglitz (1990): "Credit Rationing," Chapter 16 *in Handbook of Monetary Economics*, Vol. 2: 837-888, Elsevier B.V.

Khalily, M.A.B. 2013, "Overlapping in Microcredit Market in Bangladesh: Does It Lead to Over-Indebtedness?" in *National Conference on Microfinance and Development*, 24-25 August 2013, PKSF Auditorium, Institute of Microfinance, Dhaka.

Khalily, M.A.B. and M.A. Khaleque (2013): "Access to Financial Services in Bangladesh," in *National Conference on Microfinance and Development*, 24-25 August, PKSF Auditorium, Institute of Microfinance, Dhaka.

King, R. and R. Levine (1993): "Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence," *Journal of Monetary Economics*, 32:513-42.

Levine, R. (2005): "Finance and Growth," in P. Aghion and S.N. Durlauf (eds.), *Handbook of Economic Growth,* vol. 1A: 865-934.

Mehrotra, N., V. Puhashendhi, G. Nair and B. B. Sahoo (2009): "Financial Inclusion - An Overview," Occasional Paper 48, Department of Economic Analysis and Research, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.

MoF (2014): *Bangladesh Economic Review* (2014): (in Bangla), Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's of Bangladesh, Dhaka.

RBI (2008): *Report of the Committee on Financial Inclusion*, Reserve Bank of India, Mumbai.

Sarma, M. and J. Pais (2011): "Financing Inclusion and Development," *Journal of International Development, 23:* 613-628.

SEDF (2006): *Results of the Banking Survey of SME Market in Bangladesh*, Final Report, Dhaka.

Stiglitz, J. E. and A. Weiss (1981): "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information," *American Economic Review*, 71(3): 393-410.

UN (2006): *Building Inclusive Financial Sector for Development*, United Nations Department of Public Information, New York.

Zeller, M., G. Schrieder, J. von Braun and F. Heidhues (1997): "Rural Finance for Food Security for the Poor: Implications for Research and Policy*,"* Food Policy Review No. 4, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.